কলকাতার রাস্তাঘাট গগন যতটা ভাল চেনে, নিজের হাতের রেখাগুলোকে ততটা নয়। প্রথমে কিছু দিন ট্যাক্সি চালিয়েছিল, তারপর থেকে প্রাইভেট চালাচ্ছে। মাসে পঁয়ত্রিশশো পায়, বছরে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ে। থাকে বাগবাজারের গঙ্গার ধারের এক বস্তিতে। মাসতুতো ভাই রমাপ্রসাদ সেখানে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে আছে দীর্ঘকাল। বস্তির মুখেই তার মুদির দোকান। তারই ভরসায় আট বছর আগে গগন এসেছিল কলকাতায়। থাকা এবং খাওয়ার জন্যে মাসে হাজার টাকা সে রমাপ্রসাদকে দেয়। দু' বেলা খাওয়া আর রাত্রে ঘুমানোর জায়গার জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না।

হাতের রেখা গগন চেনে না কারণ সে ভাগ্যে বিশ্বাস করে না। দেশে যে জমিটা পৈতৃক সূত্রে সে পেয়েছে তা একবারই ফসল দেয়। কোনও পাথর বা মাদুলি ঝোলালেও দু'বার সেখানে ফসল ফলবে না। পরিশ্রম করলে ধানের বদলে কিছু শাকসবজি পাওয়া যেতে পারে। এখানে গঙ্গার ঘাটের মন্দিরে সারা দিন মাথা ঠুকলে একটা টাকাও পকেটে আসবে না। সকাল ন'টায় গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করলেই মাইনের টাকাটা ঠিকঠাক থাকবে।

মালিকের সঙ্গে গগনের চুক্তি হয়েছে, খুব অসুস্থ না হলে কামাই করা যাবে না। রবিবারে ছুটি তবে মালিকের প্রয়োজন হলে সেদিন গাড়ি বের করলে ওভারটাইম হিসেবে ধরা হবে। বছরে সে দু'বার দশ দিনের ছুটি পাবে। একবার ধান বোনার সময়, দ্বিতীয়বার ধান কাটার বেলায়। ধানবোনার আগে গগনের ভাই জমি তৈরি করিয়ে রাখে। ছেলেটা বোবা। বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। প্রতি মাসে গগন যে বাইশশো টাকা পাঠায়, তার দুশো বেরিয়ে যায় ওর ওষুধ কিনতে।

শনিবারের সন্ধ্যাবেলায় মালিক একটু উদার হন। সেদিন তিনি ক্লাবে যান তাস খেলতে, সঙ্গে পানের ব্যবস্থা থাকে। ক্লাব বন্ধ হয় এগারোটায় কিন্তু তখনও তাঁর ওঠার ইচ্ছে হয় না। তাসের নেশাকে মদের নেশা বাড়িয়ে দেয়। তারপর তাঁকে বাড়িতে নামিয়ে গ্যারাজে গাড়ি রাখতে গিয়ে রাত হয় খুব।

এগারোটার পর গ্যারাজের দরজা খোলা থাকে না। তাই শনিবার ক্লাবে ঢুকে মালিক বলেন, 'যাও, গাড়ি গ্যারাজ করে দাও। আমি মিত্তিরের গাড়িতে ফিরে যাব।'

অতএব আটটার মধ্যে গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে বস্তিতে চলে আসে সে। আজ বস্তিতে ঢোকার মুখে রমাপ্রসাদের গলা শুনতে পেল সে, 'এই গগন, গগন!'

গগন দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রমাপ্রসাদ তেল মাপতে মাপতে বলল, 'গাঁ থেকে ফোন এসেছিল। এস টি ডি বুথের রতন বলল, খুব জরুরি, তুই যেন ফোন করিস। ফোনটা করে ঘরে যা।'

'কিছু বলল? কীসের জরুরি—!'

'না। ওকে হয়তো তোর মা খুলে বলেনি।'

রাস্তার ও পাশের টেলিফোন বুথে চলে এল গগন। পকেট ডায়েরি খুলে নাম্বার দেখে ডায়াল করল। রতনের গলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি গগনদা, ফোন করতে বলেছিলি কেন?'

'মাসিমা বলেছে খুব জরুরি দরকার, তোমাকে আসতে হবে।'

'আরে দরকারটা কীসের তা বলবি তো!'

'মাসিমা আমাকে কিছু বলেনি, তবে এখানে জমি কেনার লোক ঘুরছে, সেটাই হয়তো হবে। রাখছি।' রতন ফোন রেখে দিল।

টেলিফোনের টাকা দিয়ে ঘড়ি দেখল গগন। এখন আটটা পনেরো বাজে। হাওড়া থেকে লাস্ট বাস ছাড়ে সাড়ে ন'টায়। সাড়ে এগারোটায় নেমে তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে। ন'টার বাস ধরতে পারলে ভাল হয়।

গগন রমাপ্রসাদকে জানাল সে এখনই দেশে যাচ্ছে। কাল রবিবার, ডিউটি নেই, বিকেলের পর ফিরে আসবে। রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ওখানে?'

'রতন কিছুই জানে না। গিয়ে শুনব।'

ঘরে ফিরে এসে একটা কাপড়ের ব্যাগে গেঞ্জি, পাজামা আর গামছা ভরে নিয়ে সে রমাপ্রসাদের স্ত্রীকে দেশে যাওয়ার কথা জানিয়ে যখন গলি থেকে বের হচ্ছিল, তখন রমাপ্রসাদ তাকে দোকানের কাছে যেতে বলল। গগন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কী বলছ?'

একটা সুতুলি বাঁধা ঠোঙা এগিয়ে দিল রমাপ্রসাদ, 'মাকে দিস।'

'কী আছে?'

'পোস্ত। চারশো গ্রাম। যা দাম বেড়েছে, গাঁয়ের কেউ বোধহয় কিনতে পারে না। মাসিমা খুব ভালবাসে, তাই দিলাম।' রমাপ্রসাদ হাসল। ঠোঙাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল গগন।

ন'টার বাস ধরে ভক্তহাটে যখন গগন নামল তখন এগারোটা বেজে দশ। প্রায় সব দোকানের আলো নিভে গেছে, ঝাঁপ বন্ধ। সাইকেল জমা রাখে যে সে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। গগন দেখল মাত্র দুটো সাইকেল তালাবন্দি হয়ে পড়ে আছে। দিনের বেলায় এখানে শ'-দেড়েক সাইকেল গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে সাইকেলে চেপে লোকজন এখানে জমা রেখে বাসে চেপে কাজেকর্মে বা স্কুলে চলে যায়। বিকেল থেকে চলে ফিরে আসার পালা। সাইকেল কমতে থাকে।

তিন কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। যদি কেউ—! গগন এগিয়ে গেল, 'কেমন আছ ক্ষুদিদা, এখনও পাহারা দিচ্ছ?'

'আর বলো না ভাই। দু'জন এখনও বাকি। এসে পড়ার সময় অবশ্য হয়ে গেছে।'

'কোন দিকে যাবে?'

'একজন উত্তরে, অন্য জন দক্ষিণে।'

'দক্ষিণে মানে?'

'তোমরা গ্রাম থেকে আরও দূরে।'

বলতে না-বলতেই আর একটা বাস এল। বাস থেকে নামল দু'জন। একজন সাইকেল নিয়ে চলে গেল উত্তরে। দ্বিতীয় জন যখন তালা খুলছে তখন ক্ষুদিদা বলল, 'গগনকে কি তুমি চেন মা?'

সালোয়ার কামিজ পরা, কাঁধে ব্যাগ মেয়েটি মুখ ফেরাল। অল্প আলোয় দাঁড়ান গগনকে দেখে বলল, 'মনে হয় দেখেছি।'

'ওর নাম গগন। শিবচরণপুরের ছেলে। এখন কলকাতায় চাকরি করে। ভাই গগন, এই মায়ের নাম বাসন্তী। বিজুরিতে বাড়ি।' ক্ষুদিদা বলল।

গগন মাথা নাড়ল, 'বাঃ ভাল। আচ্ছা চলি ক্ষুদিদা।'

গগন হাঁটতে আরম্ভ করল। কোনও মহিলার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। তা ছাড়া একজন অপরিচিত লোককে কোনও মহিলা সাইকেলে বসাবে কেন? যতই ক্ষুদিদা পরিচয় করিয়ে দিক।

আমারবই.কম

কয়েক সেকেন্ড বাদেই বাসন্তীর সাইকেলকে দ্রুত গতিতে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখল গগন। দিনকাল বদলে গেছে। বিজুরির মেয়ে, শুধু বিজুরি কেন, এই তল্লাটের কোনও মেয়ে রাতের এই সময়ে একা সাইকেল চালাচ্ছে, তা বিশ বছর আগেও কেউ ভাবতে পারত না। আজকাল কলকাতার রাস্তায় যেসব মহিলা গাড়ি চালান তাঁরা এত ব্যাকরণ মেনে চলেন যে মাঝেমাঝে পেছনে থাকলে গগনেরই অসুবিধে হয়।

হনহনিয়ে হাঁটছিল সে। মাটির রাস্তা শুরু হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকে এই রাস্তায় এত বার গিয়েছে যে এখন চোখ বন্ধ করলেও কোনও অসুবিধে হবে না। রাতের এই আবছা অন্ধকার কোনও সমস্যাই নয়। এই তো এক নম্বর কালভার্ট পার হল সে। বাঁকের ও পাশে গিয়ে একটু দ্রুত হাঁটতে হবে। ছেলেবেলা থেকে শোনা গুজবটা মনে সুড়সুড় করে, যদিও তার কোনও যুক্তি নেই। কেউ হলফ করে বলতে পারবে না বেন্ধেমারির বটগাছে তেনাদের ঝুলতে নিজের চোখে দেখেছে। এখান থেকে বেন্ধেমারি গ্রাম চার কিলোমিটার দূরে। তবু বটগাছটার নাম বেন্ধেমারির বটগাছ। কয়েক পুরুষ আগে বেন্ধেমারির কেউ পিতৃবিয়োগের পর স্বপ্নে জানতে পেরেছিল ওই গ্রামের মৃত মানুষদের আত্মা একটা শক্তপোক্ত গাছ পায় না, যেখানে কিছুকাল জিরোতে পারে। গ্রামের মধ্যে ওরকম গাছ থাকুক তা কেউ চায়নি বলে লোকটা এই রাস্তার পাশে ধুমধাম করে যে বটগাছের চারা লাগিয়ে গিয়েছিল, তা এখন আকাশ এমন আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যে দিনদুপুরেও সূর্যের আলো ঢোকে না।

শিবচরণপুরে ঢোকার মুখে সিনেমার সংলাপ ভেসে এল। ভিডিওতে সিনেমা দেখায় গ্রামের কয়েকটা ছেলে। দুপুরবেলায় প্রসেনজিতের সিনেমা, সন্ধের পর থেকে নামকরা হিন্দি। এখনও ছবি শেষ হয়নি। মাঠের মধ্যে ভিডিও হল তৈরি করা হয়েছে। গগন পা চালাল।

বাড়ির সামনে কাঁঠাল গাছ, পেছনে আম। এখন গাছগুলোতে ফল নেই। উঠোনে ঢোকার টিনের দরজা খুলতেই খুট করে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলা, 'কে? কে রে?'

'আমি গগন!' উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে মুখ খুলল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিয়ে মা ভেতরের দরজা খুলল, 'এসে গেছিস। আমার মন বলছিল ঠিক সময় খবরটা পেলেই তুই চলে আসবি। হাতমুখ ধুয়ে নে, আমি

ভাত গরম করছি।' মা উঠোনের ও পাশে রান্নার ঘরের দিকে এগোল।

'ভাত একটু পরে দিয়ো। আগে বলো হঠাৎ কী হয়েছে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তোকে সব বুঝিয়ে বলতে পারব না। যদুঠাকুরপো বলল এক্ষুনি ছেলেকে খবর দাও চলে আসার জন্যে। গ্রামের সবাই তো এখন এক চিন্তায় পাগল।' মা ঢুকে গেল রান্নাঘরে, 'তুই হাতমুখ ধুয়ে নে। ভাত বেড়ে দিয়ে বলছি।'

ঘর তিনটে। বহু বছর মেরামত করা হয়নি। একটা মায়ের, দ্বিতীয়টা ভাই-এর, তৃতীয়টা সে গ্রামে এলে তার। ভাই-এর ঘরে উঁকি মারল সে। বিছানা খালি। গেল কোথায়?

পাজামা পরে হাতমুখ ধুয়ে মায়ের পেতে দেওয়া আসনে বসল সে। ভাতের থালা নিয়ে এল মা। ভাত ডাল আলু পেঁয়াজ ভাজা আর পাঁচমিশেলি তরকারি।

খাওয়া শুরু করে গগন বলল, 'তোমার জন্যে রমাপ্রসাদদা পোস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি! বাঃ। কাল দুপুরে ঝিঙেপোস্ত করব।'

প্রথম গ্রাসটা চিবিয়ে গিলে ফেলে গগন বলল, 'রতন বলছিল জমি নিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছে। জমি কেনার লোক নাকি গ্রামে ঘুরছে।'

'তাই তো যদুঠাকুরপো তোকে আসতে বলল।'

'কে কিনছে? কেউ কি বিক্রি করেছে?'

'কে কিনছে তা জানি না। শুনছি সে নাকি খুব বড় ব্যবসায়ী। বলছে যার জমি তাকে দিয়েই চাষ করাবে। এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি করার কায়দা নাকি ওরা জানে। গাঁয়ের কারও কোনও ক্ষতি হবে না। তুই কাল সকালে যদুঠাকুরপোর কাছে সব শুনিস।'

মায়ের কথাগুলোতে কোনও স্পষ্ট ছবি পেল না গগন। এক ফসলি জমিকে যদি তিন ফসলি কেউ করতে পারে, তা হলে পঞ্চায়েত এত দিন কী করছিল। গতবার পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের সবাই তার গুরুজন অথবা বন্ধু। গতবার তাকে বলা হয়েছিল পঞ্চায়েতে দাঁড়াতে। সত্যমাস্টার মারা যাওয়াতে পদটা খালি হয়েছিল। কিন্তু গগন রাজি হয়নি। বছরে কুড়ি দিনের বেশি যে গ্রামে থাকতে পারবে না, তার উচিত নয় পদটায় দাঁড়ানো। তিরিশ

আমারবই.কম

বছরের ওপর যে পার্টি দেশ চালাচ্ছে, প্রত্যেকবার যাদের সে ভোট দেয়, তারা কিছু না বললেও গ্রামের মানুষের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। খবরটা জেলা সেক্রেটারির কানে গিয়েছিল। তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। ডেকে কথা বলেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন সরকারি ড্রাইভারের চাকরি খালি হলে গগনের জন্যে সুপারিশ করবেন। মনে মনে এখনও আশাটাকে জিইয়ে রেখেছে সে। সরকারি চাকরিতে প্রচুর ছুটি, গ্রামে আসতে পারবে ঘনঘন। ভাত যখন শেষ হয়েছে তখন খিড়কি দরজায় খুট্ করে শব্দ হল। মা চিৎকার করলেন, 'কে? কে ওখানে? এদিকে আয়।'

এত রাত্রে আবার কে এল? গগন উঠে দাঁড়াতেই ভাইকে দেখতে পেল। তাকে দেখতে পেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

'কোথায় গিয়েছিলি তুই?' গগন অবাক।

মা বলল, 'আর বলিস না। ইদানীং খুব নেশা হয়েছে সিনেমা দেখার। নাইট শো-তে টিকিটের দাম অর্ধেক বলে যাওয়ার জন্যে বায়না করে। মুখে ভগবান কথা দেয়নি অথচ সিনেমার নায়ক-নায়িকার মুখের কথা শুনতে ছটফট করে। যা, হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। ভোর ভোর উঠবি কিন্তু।'

মাথাটা এক পাশে অনেকটা হেলিয়ে কুয়োর দিকে চলে গেল ভাই। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'ও ভাত খাবে না?'

'সেই পৌনে ন'টায় পেট ভরে খেয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে তত ওর কুবুদ্ধি বাড়ছে। ওকে নিয়ে যে কী করি!' মা থালা গ্লাস তুলতে তুলতে বলল।

যদুনাথ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। প্রবীণ মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই গগন ওঁকে কাকা বলে ডাকে। গগনের বাবা মারা যাওয়ার পর উনি পাশে না থাকলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে যেত। এখনও তাদের এক ফসলি জমির ধানগুলো যে ঠিকঠাক থাকে, তার পেছনে ওঁর অদৃশ্য উপস্থিতি আছে।

বাড়ির উঠোনে মোড়ায় বসে যদুকাকা যার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাকে গগন চেনে। বিজুরিতে থাকে। জমির দালালি করে। শুধু জমি কেন, ঘটকের কাজও পাশাপাশি করে। গগন ভাবল তা হলে এত দিনে যদুকাকার মেয়ে ঝরনার একটা হিল্লে হতে যাচ্ছে।

দেখতে পেয়ে যদুনাথ গলা তুললেন, 'আরে, আয় গগন। এত সকালে বাস পেলি?'

'কাল রাত্রে এসেছি। বেশ রাত্রে।'

'তাই বল। ও ঝরনা, আর একটা মোড়া এনে দে। বউদিকে বললাম তুমিই ফোনে কথা বলো। তোমার গলা শুনলে পৃথিবী উলটে গেলেও গগন ছুটে আসবে। বোস।'

ঝরনা মোড়া এগিয়ে দিয়ে হাসল। তারপর যেন ভেবে পেল না কী কথা বলবে।

যদুনাথ বললেন, 'যা, চা আর মুড়ি নিয়ে আয়। চটপট যা।'

মোড়ায় বসে ছুটে যাওয়া ঝরনাকে একবার দেখে নিয়ে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার কাকা, মা ঠিক বোঝাতে পারল না, আপনি যদি বলেন—।'

'বলছি। যে আসছে তাকেই বলছি। তবে পাবলিক মিটিং-এ বলছি না কারণ পার্টি এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশ দেয়নি। এটা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার কাছে এলে যেটা ভাল মনে হচ্ছে সেটাই বলছি।' যদুনাথ বিজুরির লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক তো?'

'যথার্থ।' লোকটি মাথা নাড়ল।

যদুনাথ বলল, 'এ দিকের বেশির ভাগ জমিই হল এক ফসলি। মাথা খুঁড়লেও দু'বার ধান ফলবে না। তোমাদের জমি যেমন। এ তো আমি জন্মইস্তক দেখে আসছি। একটা হিসেব করো। তোমাদের জমিতে মাটি ঠিক করতে, সার দিতে, বীজধান পর্যন্ত কত খরচ হয়। ধান তুলে চাল বানাতে যে খরচ হয় সেটা তার সঙ্গে যোগ করো। এবার পুরোটাই যদি বাজারে বিক্রি করে দাও যে টাকা পাবে তা থেকে খরচটা বাদ দাও। যেটা থাকবে সেটাই তোমার আয়। তাই তো?'

মাথা নাড়ল গগন, 'হ্যাঁ।'

'হিসেবটা করে বলো তোমাদের হাতে কত থাকছে?'

'এমন কিছু থাকে না। কোনও মতে ডাল ভাত তরকারি খেয়ে মাস দশেক চলে যায়।'

'হুঁ। এই সেদিন পর্যন্ত অভাবে পড়ে কেউ জমি বিক্রি করতে চাইলে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিঘে বিক্রি করতে পারত না। দুই তিন ফসলি হলে আলাদা

আমারবই.কম

কথা, এক ফসলি কেনা মানে তো ধর্মের ষাঁড় কেনা। চাষের কাজেও লাগানো যায় না ষাঁড়কে। তখন দায় এমন বড় যে পঁচিশ-তিরিশ হাজারে লোকে এক ফসলি জমি ছেড়ে দেয়। এই যখন পরিস্থিতি তখন খবরটা এল। সত্যি বলছি, প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। পাগল নাকি? জমি বুঝে আশি থেকে এক লাখ বিঘে প্রতি দেবে? তা এই ব্রজ, ব্রজকিশোর, চেনো তো একে, জমির দালালি করে, বলল, একজন ব্যবসায়ীর প্রচুর জমি দরকার। পাশাপাশি জমি চাইছে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাকে সাহায্য করবে এক ফসলিকে তিন ফসলি করতে। তার জন্যে দু'-তিন বিঘে নয়, টানা বিঘের পর বিঘে জমি চাই। তা হিসেব করে দেখলাম তিন বিঘের জন্যে যদি তিন লাখ পাই তা হলে তো সোনায় সোহাগা। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে কমসে কম সাতাশ হাজার বছরে সুদ আসবে। সেই টাকা থেকে বাজারে গিয়ে চাল কিনলে বড়জোর তিন-চার হাজার খরচা। তরিতরকারিতে আরও ছয়। ধরে নিলাম দশ হাজার। আচ্ছা, আত্মীয়কুটুম এল, মাছ মাংস কিনতে হল মাঝেমধ্যে, টাকাটার সঙ্গে আরও সাত যোগ করলাম। দাঁড়াল গিয়ে সতেরো-তে। তারপরেও দশ হাজার থেকে যাচ্ছে হাতে। জামাকাপড়, অন্যান্য খরচার জন্যে চিন্তা করতে হচ্ছে না। তার চেয়ে বড় কথা খরা অথবা বর্ষার কারণে ধান শেষ হয়ে যাওয়ার দুঃখ সইতে হবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে চাষ করতে হবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকাটা যেমন ছিল তেমন থেকে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে হিসেব করে তোমার মাকে বললাম ছেলেকে ডেকে পাঠাও। তোমার জমির দু'পাশে যারা আছে, তাদের জমির জন্যে লাখ টাকা পাবে তুমি রাজি হয়ে গেলে। কারণ তা হলে অনেকটা লম্বা জমি হয়ে যাবে। ওরা তো সেইজন্যে বেশি দাম দিচ্ছে।'

প্রায় বক্তৃতার মতো কথাগুলো বললেন যদুনাথ। মন দিয়ে শুনল গগন। শুনতে শুনতে তার মাথায় যে প্রশ্নটা চলে এলে সেটাই জিজ্ঞাসা করল সে, 'এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি যদি ওরা করতে পারে, তা হলে আমাদের পঞ্চায়েত সেটা করছে না কেন?'

হাসলেন যদুনাথ, 'আমাদের সেই ক্ষমতা কোথায়?'

'সরকার যদি এগিয়ে আসে, সরকারের পক্ষে তো অসম্ভব নয়। জমিপিছু যা খরচ হবে তা না হয় ফসল পাওয়ার পর দশ বারো বছরে শোধ করে দেব।'

'তুমি আবেগের কথা বলছ গগন। সরকারের ক্ষমতার উৎস জনসাধারণ। আমরাই সরকারের হাত-পা। লোকে অভিযোগ করে সরকার কিছু করছে না। আরে, করবে কী করে? কেন্দ্রীয় সরকার যদি সাহায্যের হাত না বাড়ায় তা হলে সরকার কি করের বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে রাজস্ব বাড়াবে? তা কি হয়? তুমি বলছ দশ বছর ধরে টাকাটা সরকারকে শোধ করে দেবে। কিন্তু ভেবে দেখ এখন সরকার কোত্থেকে টাকা পাবে যে খরচ করবে? আর দশ বছর ধরে যে এখানকার লোক ঠিকঠাক শোধ করবে তার গ্যারান্টি কোথায়? কেউ যদি শোধ না করে তা হলে কি সরকার তার জমি কেড়ে নিতে পারবে? পারবে না। এখন এই সব ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসছে, ওদের হাতে টাকা আছে। টাকাগুলো জমিতে নিয়োগ করলে ওদের যেমন লাভ, আমাদেরও একই রকম লাভ হবে।' হাসলেন যদুনাথ। ঝরনা চায়ের কাপ থালায় বসিয়ে নিয়ে এল। যদুনাথ বললেন, 'নাও, চা খাও।' তারপর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে মুড়ি আনতে বললাম, আনলি না?'

'ওই যাঃ, ভুলে গিয়েছি।'

গগন বলল, 'না না। মুড়ি লাগবে না।'

'ও তাই!' ঝরনা বলল, 'কলকাতার লোক তুমি তাই মুড়ি খাও না।'

যদুনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুই যা এখান থেকে।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল ব্রজ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি একটা কথা যোগ করতে ভুলে গেলেন কাকা।'

যদুনাথ চোখ ছোট করে ব্রজর দিকে তাকালেন।

'ওই জমিতে যে তিনবার ফসল হবে সেটা তো এমনি এমনি হবে না। পরিশ্রম লাগবে। যার জমি ওরা কিনছে, সে যদি শ্রম দিতে চায় তা হলে তাকেই প্রথমে কাজ দেবে ওরা। সেই কাজের পারিশ্রমিকও ভাল। এটা এক্সট্রা রোজগার।' ব্রজ বলল।

'হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। তবে এটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। এখন অন্যের জমিতে যারা চাষ করছে তাদেরও জমির ওপর অধিকারের কথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য করেছি মালিককে। ভাগচাষি বর্গাদার—এ সব কথা মাথাচাড়া দেবেই। তবে সেসব অল্প জমির মালিকের ক্ষেত্রে হয়েছে। একরের পর একর জমি হলে নিশ্চয়ই একই নিয়ম বলবৎ হবে না। তবে ওই যে বলল, এক্সট্রা ইনকাম হবে। তার পরিমাণও কম নয়।' যদুনাথ বললেন।

আমারবই.কম

'একজন ভদ্রলোকই কিনছেন?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

ব্রজ জবাব দিল. 'ওরা চার বন্ধু একসঙ্গে মিলে প্রজেক্টটা হাতে নিয়েছে। সদরে অফিস খুলেছে। কোর্টে গিয়ে আইনসঙ্গত হস্তান্তরের আগে অর্ধেক টাকা, হস্তান্তর হয়ে গেলেই বাকিটা দিয়ে দিচ্ছে।'

'ও। তা হলে অনেকেই ইতিমধ্যে বিক্রি করে ফেলেছে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়ই। তাই তো তোমাকে তাড়া দিয়ে আনালাম। আমি বলি কী, কালকের দিনটা ছুটি নাও। সকালে ব্রজ তোমাকে সদরে নিয়ে যাবে। কাগজপত্র তৈরি করে শুভ কাজটা শেষ করে যাও।' যদুনাথ বললেন।

'জমির দলিল-টলিল ঠিক আছে তো?' ব্রজ জিজ্ঞাসা করল।

'আছে। কিন্তু আমি গেলে হবে না। মাকে যেতে হবে। সব মায়ের নামে আছে?'

'ও। তা হলে মাকেই নিয়ে যাও তুমি।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে গগন উঠে দাঁড়াল, 'আমি মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলি। বুঝতেই পারছেন, জমির মালিক মা।'

'নিশ্চয়ই বলবে। যদি মনে করো আমাকে দরকার তা হলে আমাকে ডাকবে। আমি গিয়ে তাঁকে জলের মতো করে বুঝিয়ে আসব। আর তার দরকার না হলে ব্রজ ও বেলায় গিয়ে ঠিক করে নেবে কাল কোথায় তোমরা দেখা করবে।'

মাথা নেড়ে উঠোন থেকে বাগান পেরিয়ে রাস্তার দিকে আসতেই গগন ঝরনাকে দেখতে পেল। দু' হাত পেছনের দিকে রেখে শরীর দুলিয়ে ঝরনা বলল, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গিয়েছ গগনদা।'

গগন হাসল। তারপর পা বাড়াতেই কথাটা শুনতে পেল, 'শুনেছি প্রেমে পড়লে লোকে রোগা হয়ে যায়। তাই নাকি গো?'

'তা হলে তোমার এখনই প্রেমে পড়া উচিত। অবশ্য যার প্রেমে পড়বে তাকে তো যদুকাকা মেনে নিতে পারবে না। লাভের লাভ এই হবে যে ব্রজকিশোর ঘটক গাদা গাদা পাত্রের খবর আনতে পারবে।' পা চালিয়ে বেরিয়ে এল গগন। ঝরনার মাথায় যে গোলমাল আছে তা পাড়ার সবাই জানে। যদুকাকা যে কেন ওর চিকিৎসা করাচ্ছে না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

শিবচরণপুর থেকে বিজুরি যাওয়ার পথে আগে একটা মজা খাল ছিল। বাঁশের পুল বানানো হয়েছিল কিন্তু বর্ষায় জল বাড়লে সেটা ভেসে যেত। বছর দুইয়েক হল মজাখালের ওপর চওড়া ব্রিজ হয়েছে। সেই ব্রিজের ও পাশে হরনাথদার চায়ের দোকানে গগনের সেই সব বন্ধুরা আড্ডা মারে, যারা রোজগারের জন্যে শহরে যেতে পারেনি। গগন হরনাথদার দোকানে ঢুকে দেখল জোর তর্ক চলছে। বিকাশের গলা সবার ওপরে। সে বলছে, 'তোর এক ফসলি জমি নেই বলে এর মধ্যে সাপ দেখছিস। থাকলে দেখতাম তুইও লাইন লাগিয়েছিস।'

যাকে বলা সেই যতীন সরকারবিরোধী পার্টির স্থানীয় নেতা। বছর তিনেকের মধ্যে হঠাৎই হয়ে গেল। গত পঞ্চায়েত ভোটে গো হারান হেরেছে। একসঙ্গে স্কুলে পড়া শুরু করেছিল সবাই। যতীন ফেল করতে করতে ক্রমশ ক্লাস এইটের পর আর স্কুলমুখো হয়নি। বিকাশের চিৎকারের জবাবে সে খুব শান্ত গলায় বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর বিকাশ। গোটা দেশের কোথাও না গিয়ে হঠাৎ এই আমাদের এখানে এক ফসলি জমি কিনতে এল কেন ওরা? নিশ্চয়ই পেছনে কোনও ধান্দা আছে। আর এক ফসলিকে যারা তিন ফসলি করবে তারা সেই সব জমি কিনুক যেখানে কোনও ফসলই হয় না। কিনে দু' ফসলি করে নিক। তা করছে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করা উচিত।'

যতীনের গলায় এমন কিছু ছিল যে উত্তেজনা থিতিয়ে গেল। বিকাশ গগনকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলি?'

'কাল রাত্রে।' বেঞ্চিতে বসল গগন, 'যদুকাকা মাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল। যা শুনলাম তাতে খুব একটা খারাপ লাগছে না।'

যতীন বলল, 'তোর পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে অথচ খারাপ লাগবে না?'

গগন বলল, 'তাই যদি বলিস বাবা মারা যাওয়ার পর সংসার চালাতে মাকে পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া অনেক জমি বিক্রি করতে হয়েছিল। সেটা তো মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এক ফসলি জমিকে যদি তিন ফসলি করা যায় তা হলে সরকারের কৃষি দপ্তর কি সেটা জানত না?'

যতীন হাসল, 'যদি না জেনে থাকে তা হলে বুঝতে হবে এই সরকার যাদের মাইনে দিয়ে পুষেছে তারা অপদার্থ।'

আমারবই.কম

বিকাশ প্রতিবাদ করল, 'সরকারকে আক্রমণ না করলে তোদের অস্তিত্ব লোপ পায় যতীন। যত দিন গালাগালি দিতে পারবি তত দিন তোদের দল বেঁচে থাকবে। এ ভাবে কিন্তু বেশি দিন চলে না। জনসাধারণ তোদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে।'

'আমি বলেছি অপদার্থ কর্মচারী, অমনি তোর লেগে গেল। তোদের কৃষি বিজ্ঞানীরা যা জানে না তা চারটে মাড়োয়ারি লোক আগেভাগে জেনে গেল?' যতীন উঠে দাঁড়াল, 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকছিস কেন?'

গগন অবাক হল, 'যারা জমি কিনছে তারা কি মাড়োয়ারি?'

বিকাশ বলল, 'আগেকার মাড়োয়ারি কনসেপ্টটা এখন অচল হয়ে গেছে গগন। এখন ব্যবসা করার আগে ওরা পড়াশুনা করে। প্রচুর মাড়োয়ারি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এম.বি.এ তো বটেই, বিদেশে গিয়ে অন্যান্য পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে এসে ব্যবসা করছে।' বিকাশ উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। ভক্তহাটে যেতে হবে। তুই কি আজ থাকছিস গগন?'

'এখনও ঠিক করিনি।' গগন বলল।

'থাকলে স্বপনদার সঙ্গে একবার দেখা করিস। তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

বিকাশ বেরিয়ে গেল।

যতীন গগনের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'গগন, তোর উচিত সবাইকে চা খাওয়ানো।'

গগন তাকাল, 'কেন?'

যতীন বলল, 'তোকে যখন স্বপনদা ডেকেছে তখন বোঝাই যাচ্ছে তোর কপাল খুলে যাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে সেটা হতে পারে? পঞ্চায়েতে দাঁড়ালি না, তোকে তো তার ওপরের কোনও টিকিট দেবে না। সে-সব ওরা ফিট করে রেখেছে। গিয়ে দেখ।'

বাড়িতে ফিরে মাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল গগন। মা বলল, 'ভালর মধ্যে একফোঁটা চোনা পড়বেই। এ আমি বহুকাল দেখে আসছি।'

'কী বলছ বুঝতে পারছি না।'

'ওই জমি বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে তা তো অনেক। তারপর তোর ভাইটাও জমিতে খেটে রোজগার করতে পারবে। তোকেও ছুটি নিয়ে গ্রামে

এসে সারা দিন জমিতে পড়ে থাকতে হবে না। হাতে বাড়তি টাকাও থাকবে। সব ভাল কিন্তু যারা কিনছে তারা তো বাঙালি নয়। চোনা বললাম সেই কারণে।' মা বলল।

'হ্যাঁ, ওরা শুনলাম মাড়োয়ারি। তাতে অসুবিধে কী?'

'তোর বাবা প্রায়ই বলত তাঁর বাবা নাকি বলে গেছে, যত অভাবই হোক চাষের জমি যদি বিক্রি করতে হয়, তা হলে বাঙালিকেই করবে। মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবিকে নয়। তোর বাবা যখন জমির কিছুটা বিক্রি করতে চাইল তখন কোনও বাঙালি ন্যায্য দাম দিতে রাজি হয়নি। যদুঠাকুরপো তো জলের দরে জমি কিনে নিল। তাই বলছিলাম, এই বিক্রি করাটা কি ঠিক হবে? জমি তো তোর আমার নয়। তোর পূর্বপুরুষের জমি বিক্রি করার সময় তাঁদেরই ইচ্ছার অমর্যাদা করবি?'

মাথা নাড়ল গগন, 'দেখো মা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বদলে যায়। প্রচণ্ড বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যদি ওই জমি বিক্রি করতে হয় তা হলে বাপঠাকুর্দার কথা ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এখন সেরকম বিপদ আমাদের সামনে নেই তাই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করতেই পারি। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে ওই মাড়োয়ারিরা আমাদের এলাকায় জমি কিনছে কেন? আজ হরিদার চায়ের দোকানে গিয়ে শুনে এলাম ওরা নাকি হাইওয়ের ধারের কিছু জমি এর মধ্যেই কিনে ফেলেছে। কেন? ও সব জায়গায় বছরের আট মাস অল্প হলেও জল জমে থাকে।'

'তোর বন্ধুরা কী বলল?' মা জিজ্ঞাসা করল।

'ওরা কিছু জানে না। আমি কলকাতায় যার গাড়ি চালাই তার পাশের বাড়িতে একজন নামকরা রিপোর্টার থাকেন। তাঁকে খবরটা দিলে তিনি নিশ্চয়ই কারণ বলতে পারবেন। তোমার মনেও যখন খুঁত লেগেছে তখন যদুকাকার কথায় তড়িঘড়ি না করে কিছু দিন অপেক্ষা করে দেখি, তুমি কী বলো?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'সেই ভাল।'

কাল সকালে ডিউটিতে যেতে হলে আজ সন্ধের মধ্যে বাস ধরতে হয়। দুপুরের ভাত খেয়ে লম্বা ঘুম দিল সে। কলাই-এর ডাল আর ঝিঙে-পোস্ত দারুণ জমেছিল। মা ও দুটো বানায়ও খুব ভাল।

আমারবই.কম

বিকেল চারটের সময় যদুকাকার গলা শুনে ঘুম ভাঙল গগনের। বেশ জোরে হাসছেন। মা বলল, 'আপনি হাসছেন কিন্তু সত্যি এটা হাসির কথা নয় ঠাকুরপো।'

'আচ্ছা বউদি, ষাট বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। এত বছরেও যদি ভারতবর্ষের মানুষ এক না হতে পারে তা হলে কবে হবে? তামিল, তেলুগু, গুজরাতি পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারি বা বাঙালির মধ্যে কোনও পার্থক্য এখন আছে? সবাই ভারতীয়। জমি মাড়োয়ারি কেনা যা, বাঙালি কেনাও তা। আপনার জমিটা বিক্রি হয়ে গেলে আমাদেরটার দামও বেশি পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তো সবসময় আপনাদের পাশে আছি। দিন তিনেক ভেবে দেখুন। গগনকে আর ছুটি নিয়ে আসতে হবে না। বেচারার মাইনে কাটা যাবে। আমিই না হয় আপনাকে নিয়ে সদরে যাব। ওরাই সব কিছু করে দেবে। আপনি শুধু সই করে দেবেন। আমিই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকাটা জমা দেবার ব্যবস্থাও করে দেব। দিনকাল তো ভাল নয়, টাকাটা নিয়ে গাঁয়ে ফেরা উচিত কাজ হবে না।' যদুকাকা প্রসঙ্গ ঘোরালেন, 'আপনার কিন্তু এখনই আর একটা কাজ করা উচিত। সময় তো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'কী কাজ?'

'গগনের বিয়ে দেবেন না?'

'ও। সে বিয়েতে রাজি নয়। বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যার তাকে বিয়ের কথা বলছ। ভেবে দেখলাম ঠিকই বলেছে। এখন একা আছে, যা রোজগার করছে, তা থেকে আমাদের দিয়ে মোটামুটি চলে যাচ্ছে ওর। বিয়ে করলে খরচ তো বাড়বেই।'

'দেখুন কথায় বলে চিনি জোগাবেন চিন্তামণি। বিয়ের পর যে খরচ বাড়বে তার জন্যেই তো জমি বিক্রির টাকার সুদ ঘরে আসবে। এই পরিবার থেকে একজনকে জমিতে কাজ দিতে ওরা বাধ্য। ছোট কাজ পাবে। সংসারের রোজগারও বাড়বে। আর তার পরে যদি দরকার হয় তা হলে তো আমি আছি।' যদুকাকাকে বলতে শুনল গগন।

'আপনার কাছে তো সাহায্য নিয়েই চলেছি। আর কত?' মা বলল।

'ছি ছি ছি। এ কী বললেন বউদি। গগনের বাবাকে আমি বড় ভাই-এর মতো দেখতাম। তাঁর অবর্তমানে যা করেছি তা আমার কর্তব্য ছিল। সাহায্য বলছেন কেন? আমি আপনাকে অন্য কথা বলছিলাম। আমার অনেক দিনের

বাসনা। ঝরনাকে এ বাড়ির বউ করে আপনি আনুন।'

যদুকাকার গলার স্বর খুব নরম হয়ে গেল।

'ঝরনা?'

'হ্যাঁ। আজ গগনকে দেখে কী খুশি। সাততাড়াতাড়ি চা বানিয়ে দিল। মা মরা মেয়ে, সম্বন্ধ আসছে দূর দূর থেকে। দূরে পাঠাতে মন চায় না বউদি।'

গগন ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে একগাল হাসল যদুকাকা, 'তোমার মায়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। বটেই তো, কথায় বলে ভাবিয়া করিয়ো কাজ করিয়া ভাবিয়ো না। দু'দিন তোমরা ভাবো। তা হলে আজই ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ। একটু বাদেই বের হব।'

'এত তাড়াতাড়ি? ভক্তহাটে তো রাত ন'টা পর্যন্ত বাস পাওয়া যায়।'

'স্বপনদা নাকি খোঁজ করছিল, দেখা করে যাব।'

'স্বপন? কই, পরশু আমার সঙ্গে দেখা হল, কিছু বলল না তো!'

স্বপনদা পার্টির লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারি। যদুকাকা গ্রামের নেতা, পঞ্চায়েতের সদস্য, পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী। গ্রামের মানুষের সঙ্গে পার্টি তাঁর মাধ্যমে যোগাযোগ করে আসছে।

গগন বলল, 'কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়তো—।'

'অ। কোথায় যাবে? বাড়িতে না পার্টি অফিসে?'

'যেখানে ওঁকে পাব।'

'বাড়িতে যেয়ো না। শুনেছি ওর এক মামাতো বোন কলকাতা থেকে এসেছে। লোকে বলছে তার স্বভাব নাকি ভাল নয়। স্বপনের বোন বলে চুপ করে আছে সবাই। আচ্ছা, চলি তা হলে।' একটু গম্ভীর হয়েই বেরিয়ে গেলেন যদুকাকা।

মা বলল, 'কী করি বল তো? যদুঠাকুরপো আমাকে নিয়ে সদরে যাবে বলছে। জোর করছে বিক্রি করার জন্যে। একসময় উপকার করেছিল, এক পাড়ায় থাকি, সম্পর্ক নষ্ট হলে—!' মা চিন্তায় পড়ল।

'আমি মঙ্গলবার তোমাকে ফোন করব। এই ধরো রাত ন'টার সময়। ভাইকে বুথে বসিয়ে রেখো। আমি বললেই যেন তোমাকে খবর দেয়। আমি দশ মিনিট পরে আবার ফোন করব। তখনই বলে দেব কী করতে হবে।' গগন বলল।

'যদি লাইন না পাস?' মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'না পেলে চলে আসব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টেলিফোন বুথে রতনের সঙ্গে কথা বলল গগন। মঙ্গলবার রাত্রে সে ফোন করলে যদি ভাই বুথের সামনে না থাকে তা হলে যেন অবশ্যই মাকে খবর দিয়ে ডাকিয়ে আনে। রতন তাকে আশ্বস্ত করল।

আজ রবিবার। গ্রাম থেকে ভক্তহাটে ডেলি প্যাসেঞ্জাররা সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আসা করবে না। উটকো কেউ যদি সাইকেলে যায় সেই আশায় গগন চার পাশে তাকাল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভক্তহাট বিজুরির উলটো দিকে।

হঠাৎ পেছন থেকে চিৎকার ভেসে এল। মেয়েলি গলায় তার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। গগন মুখ ফিরিয়ে দেখল সাইকেলে চেপে ঝরনা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। ওই মোটা শরীরেও যে মেয়েটা ও ভাবে সাইকেল চালাতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করত না গগন। পাশে এসে সাইকেল থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল ঝরনা।

'কী ব্যাপার?' গগন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

একটা খাম এগিয়ে দিল ঝরনা, "বাবা বলল তোমাকে এটা দিতে। তুমি যেন ভক্তহাটে গিয়ে স্বপনদার হাতে দিয়ে দাও।'

'কী আছে ওতে?'

'আমি কী করে বলব?'

'দাও।'

'তুমি হেঁটে যাবে?'

'উপায় কী?'

'আমার সাইকেলে যেতে পারো।'

'ফেরত দেব কী করে?'

'ওমা। আমি ফেরত নিয়ে আসব। আমি তো মাঝেমাঝেই ভক্তহাটে, বিজুরিতে যাই। নাও ধরো।' সাইকেলটা এগিয়ে দিল ঝরনা।

একটু স্বস্তি পেল গগন। তার পরিশ্রম এবং সময় কিছুটা বাঁচল। সাইকেলে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তা হলে হেঁটে আসছ!'

'মানে? আমি অতটা পথ হাঁটব? হাত সরাও।' সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে

সামনের রডে উঠে বসল ঝরনা। গগনের মনে হল দুটো চাকা বসে গেল অনেকটা। গুছিয়ে বসে ঝরনা বলল, 'চালাও।'

গগন চার পাশে তাকাল। ঝরনাকে সাইকেলে বসিয়ে সে যাচ্ছে দেখলে গল্প তৈরি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মেয়েটা সেটা গ্রাহ্যই করছে না। সে প্যাডেলে চাপ দিল। বেশ ভারী লাগছে, সামলে নিতে একটু সময় লাগল।

বিরক্ত হয়ে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী চালের ভাত খাও?'

'আমন।' চটপট জবাব এল।

হতাশায় শ্বাস ফেলল গগন। এ মেয়ে ব্যঙ্গও বোঝে না। কিন্তু দুটো হাতে হ্যান্ডেল ধরতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মেয়েটার শরীরের আয়তন বাঁচানো যাচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ যাওয়ার পরে ঝরনা বলল, 'বেন্ধেমারির বটগাছটার নীচে একটু দাঁড়িয়ো তো গগনদা।'

'কেন?'

'গাছটাকে প্রণাম করে যাব।'

'হঠাৎ?'

'তুমি কী গো? ফেরার সময় একা ফিরতে হবে না? তখন গাছ থেকে যদি কোনও বদ আত্মা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে? যাওয়ার সময় প্রণাম করে গেলে ভাল আত্মারা খুশি হবে, ফেরার সময় আমাকে রক্ষা করবে, ভয় থাকবে না।'

'ওই গাছে আত্মা ঝুলতে কেউ কি দেখেছে?'

'কত লোক দেখেছে! এখন নাম করব না, এই সময় নাম করতে নেই, প্রত্যেক অমাবস্যায় তাঁদের সবাই জড়ো হন ওই বটগাছে।'

'ও।' হাসল গগন, 'তোমার বাবাকে বলব তেনাদের মধ্যে একটি ভাল পাত্র বেছে নিয়ে তোমার সঙ্গে যেন বিয়ে দিয়ে দেন। তা হলে তুমিও ওই গাছে গিয়ে আরামে থাকতে পারবে।'

ঝরনা জবাব দিল না। গগনের মনে হল বেশ চটে গিয়েছে ও। চুপচাপ সাইকেল চালাতে লাগল গগন। হঠাৎ ঝরনা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা গগনদা, তুমি একটা সত্যি কথা বলবে?

'জিজ্ঞাসা করো।'

'তুমি কোনও মেয়েকে চুমু খেয়েছ?'

আমারবই.কম

ঝরনার মাথাটা প্রায় নাকের সামনে। মুখ পেছনে সরিয়ে নিল গগন, 'না'।

'আমিও খাইনি গো। আমার খুব ভয় হয়!'

'কীসের ভয়?'

'চুমু খেতে গিয়ে যদি দাঁতে দাঁত লেগে যায়।'

'পরীক্ষা করে দেখ, লাগে কিনা!'

'বাচ্চাদের খেয়েছি, লাগে না।' ঝরনা চেঁচাল, 'বেল্কেমারির বটগাছ আসছে।'

সাইকেল দাঁড় করাতেই নেমে পড়ল ঝরনা। জায়গাটায় ইতিমধ্যেই অন্ধকার নেমে গেছে। অথচ বটগাছের বাইরের চার দিকে যথেষ্ট আলো।

গাছের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বিড়বিড় করতে লাগল ঝরনা। তারপর তিনবার প্রণাম করে বলল, 'তোমরা আমাকে দেখ, আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ো।'

সাইকেলের কাছে ফিরে এল ঝরনা, 'চলো। আমি গাছের বাইরে গিয়ে সাইকেলে উঠব।'

'কেন?'

'ওপরে তেনারা আছেন না। তাঁদের সামনে পরপুরুষের সঙ্গে এক সাইকেলে গেলে অসন্তুষ্ট হবেন।' ঝরনা হাঁটা শুরু করল।

গগনের মনে হল যদুকাকার মেয়েটার পাগলামি আরও বেড়ে গেছে।

গাছের চৌহদ্দি পেরিয়ে এসে সে বলল, 'আর দরকার নেই, এখান থেকে খানিকটা পথ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি, তুমি ফিরে যাও, সন্ধে হয়ে আসছে।'

'ও মা! ফিরে যাব কেন? আগে দু' চোখ ভরে দেখি, তারপর ফিরব।' ঝরনা মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলল।

'কী দেখবে?'

'স্বপনদার মামাতো বোনকে। সবাই বলছে খুব রংঢং করতে পারে।'

'উঃ। যাও, বাড়ি যাও। আমি কিন্তু খুব রাগ করব।'

বড় বড় চোখে দেখল ঝরনা। তারপর গগনের হাত থেকে সাইকেল নিয়ে কোনও কথা না বলে গ্রামের দিকে চলে গেল।

পার্টি অফিসেই স্বপনদাকে পাওয়া গেল। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাকে দেখে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললেন। গগনের মনে হল সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলোতে স্বপনদাকে যে রকম দেখেছিল এখনও তাই আছেন। শুধু দাড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে। সেই হ্যান্ডলুমের হাতা গোটানো পাঞ্জাবি, পাজামা, অযত্নের দাড়ি, ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মানুষের বিপদ-আপদে ছুটে যাওয়া আর পার্টির কাজ করা ছাড়া ওঁর কোনও জীবন নেই। এই তল্লাটে যারা বিরোধী দল করে তাদের অন্যতম সমস্যা হল স্বপনদা। এই মানুষটিকে আক্রমণ করার জন্যে কোনও তথ্য তারা পায় না। স্বপনদার জন্যেই পঞ্চায়েত, স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে বিধানসভা এবং লোকসভায় পার্টি বিপুল জনসমর্থন পেয়ে আসছে। ভক্তহাট প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক স্বপনদার আর্থিক অবস্থা অনেকের চেয়ে খারাপ কিন্তু তা নিয়ে ওঁকে বিব্রত হতে কেউ দেখেনি। এখন বছরখানেক পার্টি করলেই ছেলেরা মোটরবাইক কিনে ফেলে, পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়েই ঢালাই ছাদের বাড়ি তৈরি করে ফেলে। স্বপনদার পদে অন্য এলাকায় যারা আছে, তাদের পরিবারের লোকজন দু' হাতে কামাচ্ছে। মানুষ তো এ সব দেখে।

স্বপনদা বেরিয়ে এল লোকগুলোর সঙ্গে। বলল, 'তা হলে ওই কথাই রইল। মিছিল নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু মিছিলের সামনে কোনও মোটরবাইক থাকবে না।'

'ছেলেরা খুব চাইছিল—!' একজন জানাল।

'এখন তো অনেকেই অনেক কিছু চাইছে। মিছিলের আগে যারা মোটরবাইক চালায়, তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মাস্তানবাহিনী যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদের দিকে ভয়ের চোখে তাকায়। মিছিলটা তখন আর গাঁয়ের গরিব মানুষের মনের সমর্থন পায় না। মোটরবাইকে না চেপে ওদের বলো পায়ে হেঁটে মিছিলে যেতে। এসো তোমরা। হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ ভাই, গগন তো?' এগিয়ে এলেন স্বপনদা।

'হ্যাঁ।'

'আজকাল আমার খুব ভুল হচ্ছে। চট করে নাম মনে করতে পারি না। ধরো, তোমার সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু কিছুতেই নামটা মনে করতে পারতাম না। সেই নাম মনে এল রাত্রে বিছানায় শোওয়ার পর। এটা একটা অসুখ।

আমারবই.কম

অসুখটা যত দিন যাবে তত বাড়বে। শেষ পর্যন্ত—।' হাত নেড়ে শূন্যে কিছু মুছলেন তিনি।

'আপনি কিন্তু আমার নামটা ভুল বলেননি।' গগন বলল, 'এই খামটা আপনাকে দেওয়ার জন্যে যদুনাথকাকা দিতে বলেছেন। শিবচরণপুরের যদুনাথ—।'

গগনকে থামিয়ে দিলেন স্বপনদা, 'আরে অত খারাপ অবস্থা আমার নয়।'

'তা হলে আমি চলি।'

'গ্রামে ফিরে যাচ্ছ?'

'না। কলকাতায়। কাল সকালে ডিউটি আছে।'

'আমি যেন কেন তোমার খোঁজ করছিলাম—!' চোখ বন্ধ করলেন স্বপনদা।

'হ্যাঁ, বিকাশ সেরকম কথা বলছিল।'

'মনে পড়েছে। তুমি যে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলে সরকারি ড্রাইভারের চাকরির জন্যে, আমি সেটা এমপ্লয়মেন্ট অফিসারকে দিয়েছিলাম। এই জেলায় দু'জন ড্রাইভার নেওয়া হবে। তোমার নাম ওরা পাঠিয়েছে অন্যদের সঙ্গে। যে কোনও দিন তুমি চিঠি পাবে ইন্টারভিউ-এর জন্যে।' স্বপনদা বললেন, 'আচ্ছা। এসো তা হলে।'

গগনকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আবার ঘরে ঢুকে কাগজপত্র নিয়ে বসতেই কয়েকজন কর্মী চলে এল। জমি নিয়ে যে খচখচানি ছিল মনে সেটা একপলকে চলে গেল গগনের। এই কয় বছরে কলকাতায় নানান কোম্পানির গাড়ি চালিয়েছে সে। তাই ড্রাইভারি পরীক্ষায় সে ফেল করবে না। ইন্টারভিউতে গেলে সে চাকরিটা পাবেই। কাছাকাছি যদি পোস্টিং হয়, তা হলে মা ভাই-এর সঙ্গে থাকা যাবে। কয়েক পা এগিয়ে সে থেমে গেল। মাড়োয়ারিদের জমি কেনার ব্যাপারটা নিয়ে স্বপনদার সঙ্গে কথা বললে ভাল হত। স্বপনদা নিশ্চয়ই ঠিক উপদেশ দিতেন। কিন্তু ইন্টারভিউ-এর খবরটা শোনার পর আর স্বপনদাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না তার। হাতে তো এখনও সময় আছে। দেখা যাক।

ভক্তহাটের বাসস্ট্যান্ড এখন জমজমাট। দোকানপাট খোলা, আলো জ্বলছে চারধারে। রেডিও বাজছে পানের দোকানে। শুধু ক্ষুদিদার সাইকেল রাখার দোকান আজ বন্ধ।

লোক্যাল বাস পরপর কয়েকটা এল। ছেড়ে দিল গগন। এরা ঘুমাতে ঘুমাতে যাবে। এক্সপ্রেস বাস অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়।

'কীরে? তুই এখানে দাঁড়িয়ে?' বিকাশ এসে জিজ্ঞাসা করল।

'কলকাতায় যাচ্ছি।'

'ও। স্বপনদার সঙ্গে দেখা করেছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কী ব্যাপার রে?'

'একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, বললেন ইন্টারভিউ পেতে পারি।'

'তার মানে চাকরিটা তোর হয়ে গিয়েছে। আয় এ দিকে আয়।'

বিকাশ তার হাত ধরে যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে এনে বলল, 'এ আমার বাল্যবন্ধু, গগন। কলকাতায় চাকরি করে। স্বপনদা খুব স্নেহ করেন ওকে।'

আমারবই.কম

বছর তেইশ চব্বিশের সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটি হাতজোড় করল, 'আমি কুসুম।' বলেই হাসল, 'একশো বছর আগের নাম। ঠাকুমা রেখেছিল।'

বিকাশ বলল, 'এখন তো আগের স্টাইল নতুন করে ফিরে আসছে।'

গগন কিছু বলল না। বিকাশ বলল, 'আপনাকে তা হলে মোবাইলে ফোন করব।

মাথা নাড়ল কুসুম, 'আমার মোবাইল চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।'

'ওহো, গগন, উনি হলেন স্বপনদার মামাতো বোন। বেড়াতে এসেছিলেন।' বিকাশ বলল।

'স্বপনদার বাড়িতে ছিলেন?'

'না। স্বপনদার পাশের বাড়িতে ওঁর ছোটভাই তপনদা থাকেন, তার ওখানে ছিলেন।' তপনদা বড় ব্যবসায়ী। সেটা ওর ঘরবাড়ি দেখলেই বোঝা যায়।

এই সময় এক্সপ্রেস বাস এসে দাঁড়াতেই বিকাশ দৌড়ে গিয়ে কন্ডাক্টারকে কিছু বলল। কন্ডাক্টার মাথা নেড়ে বলল, 'আসুন দিদিভাই, ওই জানলার পাশের সিটে চলে যান।'

কুসুমকে বাসে উঠতে সাহায্য করল বিকাশ। আরও কয়েকজনের সঙ্গে বাসে উঠে গগন, দেখল একেবারে পেছনের সিট খালি আছে। ঝাঁকুনি

খেতে হবে খুব। সেখানে গিয়ে বসতেই চোখে পড়ল বিকাশ বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে কুসুমকে হাত নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছে। ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করলে সে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

গগন বুঝল এই মেয়েটির কথা বলেছিল যদুকাকা, ওকে দেখতেই ঝরনা উৎসুক ছিল। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে স্বভাবচরিত্র খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মেয়েটা এখানে এসে স্বপনদার বাড়িতে না উঠে বড়লোক মামাতো ভাই-এর বাড়িতে উঠল কেন? উঠল তবু ওর পরিচয় হল স্বপনদার মামাতো বোন।

যাই হোক, এই ক'দিনেই বিকাশের সঙ্গে মেয়েটির ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। যেভাবে বাসে তুলে দিয়ে কথা বলে গেল তাতে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাস ছুটছিল দ্রুত গতিতে। চোখ বন্ধ করল গগন। সরকারি চাকরিটা পেয়ে গেলে মালিককে জানাতে হবে। লোকটা নিশ্চয়ই খুশি হবে না। মাসের মাঝখানে ছাড়লে মাইনে দেবে না। যা হওয়ার তা হবে, এখন ভেবে কোনও লাভ নেই।

আধঘণ্টা ছুটে বাস থামল। কিছু লোক নামল। আবার দৌড় আরম্ভ হওয়ার পর সে দেখল কন্ডাক্টার তার দিকে এগিয়ে আসছে। পকেটে হাত দিল গগন টাকা বের করতে। কন্ডাক্টার বলল, 'আপনাকে সামনে ডাকছে। ওঁর পাশের সিট খালি হয়েছে।' কথাগুলো বলে লোকটা ফিরে গেল।

সমস্যাটা কী? তাকে ডাকছে কেন? উশখুশ করেও শেষ পর্যন্ত ছুটন্ত বাসের ঝাঁকুনি সামলে কুসুমের সিটের পাশে চলে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ডেকেছেন?'

কুসুম চোখের কোণে তাকে দেখল। বাঁ হাত দিয়ে পাশের খালি সিট দেখিয়ে দিল। ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসল গগন, 'বলুন।'

'এতটা পথ মুখ বুজে যেতে ভাল লাগে? অবশ্য আমার পাশে বসে গল্প করতে আপনার যদি আপত্তি থাকে তা হলে আলাদা কথা!' কুসুম হাসল।

গগন থমকে গেল। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'না না, ঠিক আছে।'

'কলকাতায় কোথায় থাকেন?'

'বাগবাজারে।'

'ও মা, আমি থাকি শোভাবাজারে। মেট্রো স্টেশনের তিন মিনিট দূরে।'

'ও।'

'আপনার ফ্যামিলি কি কলকাতায় থাকে?'

'ফ্যামিলি?'

খুব হাসল কুসুম, 'মা বাবা ভাই বোন, স্ত্রী ছেলে মেয়ে—।'

'আমার বোন স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে নেই। বাবা গত হয়েছেন।'

'ও।' কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'বিকাশ আপনার বন্ধু?'

'কেন?'

'এরকম পাগল ছেলে আমি কখনও দেখিনি। দু'দিনের আলাপেই মনে হচ্ছে আমার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারে।' কুসুম ঠোঁট মোচড়াল।

গগন কোনও জবাব দিল না। কুসুম বলল, 'এই দেখুন, তখন থেকে শুধু আমিই কথা বলে যাচ্ছি। আপনার কোনও কথা নেই?'

'আপনি যা জানতে চাইছেন তার জবাব তো দিচ্ছি।'

'বেশ, গগনবাবু, আপনি কোথায় চাকরি করেন?'

গগন খুশি হল। কুসুমকে থামাবার পক্ষে উত্তরটা যথেষ্ট হবে। ওর পোশাক দেখে বোঝাই যায় আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে নিশ্চয়ই কুসুম আর গল্প করতে চাইবে না।

'টিকিট!' কন্ডাক্টার এসে দাঁড়াল।

মুখ ঘুরিয়ে গগন জিজ্ঞাসা করল। 'কলকাতা কত?'

'ষাট টাকা দিন।'

'ষাট? এত ভাড়া তো হওয়ার কথা নয়। ভক্তহাট থেকে উঠেছি।'

'জানি। এটা এক্সপ্রেস বাস।'

'আমি জানি আঠাশ তিরিশ টাকা ভাড়া।' গগন প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

'ঠিকই জানেন। তা হলে দিতে আপত্তি করছেন কেন? একজনের তিরিশ হলে দু'জনের কি ষাট হয় না ভাই?' কন্ডাক্টার নির্লিপ্ত মুখে বলল।

বুঝতে পারল গগন। লোকটা কুসুমের টিকিটের দাম তার কাছে চাইছে! সে কুসুমের দিকে তাকাল। কুসুম হাসল, 'আসার সময় এই বাসে আমি তিরিশ দিয়েছি।'

তা হলে ফেরার সময় হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? বের করুন টাকা। মনে মনে কথাগুলো বলামাত্র কন্ডাক্টার বলল, 'দিন ভাই।'

পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিতে কন্ডাক্টার

আমারবই.কম

টিকিট আর ফেরত টাকা দিয়ে চলে গেল। কুসুম বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

খুব গায়ে লাগছিল গগনের। ইচ্ছে করছিল কুসুমের পাশ থেকে উঠে পেছনের সিটে গিয়ে বসতে।

'আপনার মোবাইল নাম্বার আছে?' কুসুম জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'ল্যান্ড নাম্বার?'

'না।'

'আপনি বিকাশদার মতো পার্টি করেন না?'

গগন কুসুমের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, আমার এখন কথা বলতে একটুও ভাল লাগছে না। দোহাই, একটু চুপ করুন। কথাগুলো শুনতে পেল না কুসুম কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে।

শেওড়াফুলির ধাবার সামনে বাসটা দশ মিনিটের জন্যে দাঁড়াল। যাত্রীরা ওই সময়ের মধ্যে যদি চায় তা হলে চা খেয়ে নিতে পারে।

গগন উঠে দাঁড়াতেই কুসুমও উঠে পড়ল। এখন সন্ধের অন্ধকার ঘন হয়েছে। আলো জ্বলছে দোকানগুলোয়। কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চা খাবেন?'

'হ্যাঁ।' গগন চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমি যদি একটা কোল্ডড্রিংক নিই তা হলে কি আপত্তি আছে?'

'আপনার যা ইচ্ছে তাই খান, আমি আপত্তি করব কেন?'

'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?'

'ওই তো ও পাশে দোকান। চলে যান। কোনও ভয় নেই।'

চা খেতে খেতে গগন দেখল তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কুসুম বোতলের ঠাণ্ডা পানীয় স্ট্র দিয়ে টানছে। চায়ের দাম দু'টাকা, ঠাণ্ডা পানীয়ের দাম কত? সে চা খেয়ে বাসে উঠে গেল। একটু বাদে কুসুম এল। নিজের জায়গায় বসে হেসে বলল, 'আপনি মানুষটা বেশ অদ্ভুত।'

গগন জবাব দিল না।

'বোধহয় স্বপনমামা আপনার গুরু। তাই না?'

'স্বপনদাকে আপনার অদ্ভুত বলে মনে হয়?'

'অদ্ভুত না? কাঠখোট্টা। কিন্তু জানেন, আমার বেশ মজা লাগছে।'

'কীরকম?'

'ছেলেদের সঙ্গে আলাপ হলেই দেখি তারা আমাকে খুশি করার চেষ্টা করে। আমাকে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে চায়, সিনেমায় যেতে বলে। আমি অবশ্য তাদের কাটিয়ে দিই। এই যেমন আপনার বন্ধু বিকাশ বার বার বলছিল আরও দু'দিন ভক্তহাটে থেকে যেতে। আমাকে একটা প্রাচীন মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। আমি থাকলাম না। অথচ আপনি আমাকে একটা কোল্ডড্রিঙ্ক খাওয়ালেন না!'

'সব মানুষ একরকম হয় না।' গগন বলল।

'জানি তো। তাই যারা আলাদা তাদের আমি পছন্দ করি।'

বাকি পথটা চোখ বন্ধ করে বসে রইল গগন। যেন খুব ঘুম পেয়েছে তার। কলকাতায় বাস ঢুকল। ধর্মতলায় পৌঁছানো মাত্র যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে নেমে যাচ্ছিল। গগন তাদের সঙ্গী হল। কুসুম কিছু বলার আগেই সে রাস্তা পেরিয়ে একটা টু-বি বাস পেয়ে গেল। একটু অভদ্রতা হয়তো হল, গগন মাথা নাড়ল, কুসুম সঙ্গে থাকলে সে বাধ্য হত ট্যাক্সি নিতে। আরও ষাট সত্তর টাকা বেরিয়ে যেত। তিরিশ গিয়েছে, অযথা একশ টাকা খরচ করার মতো তার আর্থিক অবস্থা নয়।'

আমারবই.কম

মালিক বের হবেন সকাল সাড়ে ন'টায়। আজ আট'টার একটু পরে গগন গিয়ে গাড়ি বের করে ধোলাইওয়ালার কাছে দিয়ে দিল। পাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিক ভদ্রলোক মোবাইলে কথা বলছিলেন। সে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কথা শেষ করে ভদ্রলোক তাকে দেখলেন। গগনকে তিনি এর আগে বহুবার দেখেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। একটু যদি সময় দেন—।' গগন এগিয়ে গেল।

'এসো।' ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন সাংবাদিক। বললেন, 'বসো।'

খানিকটা দূরের চেয়ারে বসল গগন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। আমাদের ওখানে কেউ কখনও শোনেনি যে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি করা যায়।'

'ঠিকই। তা হলে দেশটা শস্যে ভরে যেত।'

এবার গগন তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলল। শুনতে শুনতে ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। একটা প্যাডে গ্রামের নামগুলো লিখলেন।

তারপর বললেন, 'তুমি বলছ হাইওয়ের পাশে নিচু জমিগুলো ওরা কিনে নিয়েছে।'

'বেশ কয়েক বিঘে।'

'বলছে এক ফসলিকে তিন ফসলি করবে?'

'হ্যাঁ। যার জমি তার একজনকে চাষের কাজ দেবে।'

'তুমি তোমার জমি বিক্রি করেছ?'

'না। তবে খুব চাপ আসছে। পঞ্চায়েত থেকেও চাইছে।'

'একটা দিন অপেক্ষা করো।'

'ঠিক আছে।' মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল গগন।

পরদিন ডিউটি যাওয়ামাত্র মালিক বললেন, পাশের বাড়ির সাংবাদিক তাকে দেখা করতে বলেছেন। গাড়ি বের করে ধোলাইওয়ালাকে দিয়ে গগন পাশের বাড়িতে গেল। তাকে দেখে সাংবাদিক বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি আজই রিপোর্টার পাঠাচ্ছি তোমাদের এলাকায়। তুমি ভাই কয়েকটা নাম দাও যাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে ও।'

'ভক্তহাটের স্বপনদা। পার্টির নেতা, আমার গ্রাম শিবচরণপুরের যদুনাথবাবু, পঞ্চায়েতের সদস্য। বিজুরির যতীন বিরোধী দলের সমর্থক।

'বেশ। তুমি গ্রামের মানুষকে জানিয়ে দাও কেউ যেন এদের জমি বিক্রি না করে। সরকার নতুন শিল্প স্থাপন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন বলে আমরা জানি। বিভিন্ন বিদেশি শিল্পপতির সঙ্গে আলোচনা চলছে। কিন্তু কোথায় শিল্পের কারখানা তৈরি হবে তা নিয়ে আলোচনা না ওঠায় কেউ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু সরকারের ভাবনাচিন্তা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে ওই ব্যবসায়ীরা। ওরা তাই সস্তায় তোমাদের কাছ থেকে জমি কিনে নিচ্ছে যাতে সরকার জমি কিনতে চাইলে বেশি দামে বিক্রি করে মোটা মুনাফা পেতে পারে। এখনও এ সব আমাদের অনুমান। আজ এক বিদেশি শিল্পপতি কলকাতায় আসছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা যদি ফলপ্রসূ হয় তা হলে আমরা সঠিক খবর পেয়ে যাব।'

'তার মানে আমাদের ওখানে শিল্পের জন্যে কারখানা তৈরি হবে?'

'হ্যাঁ। সে জন্যে অনেক জমি দরকার হবেই।'

'তা হলে এক ফসলিকে তিন ফসলি করার ব্যাপারটা মিথ্যে?'

'অবশ্যই। সরকার বলছেন কারখানার জন্যে দুই বা তিন ফসলি জমি তারা

নেবেন না। এক ফসলি জমিকে যদি তিন ফসলিতে পরিণত করা সম্ভব হত তা হলে সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকত না। তুমি এখনই খবরটা পাঠিয়ে দাও। তোমার মোবাইল ফোন আছে?' সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ্ঞে না।'

'গ্রামের কারও ফোন নাম্বার জানো?'

গগন এস টি ডি বুথের নাম্বার জানাল। সাংবাদিক তাঁর মোবাইলে নাম্বারটা ডায়াল করে এগিয়ে দিলেন, 'নাও, কথা বলো।'

রিং হচ্ছিল। তারপরেই রতনের গলা পেল গগন। সে বলল, 'আমি কলকাতা থেকে গগনদা বলছি।'

'ও, গগনদা, তোমার তো রাতের বেলায় ফোন করার কথা ছিল।' কানফাটানো চিৎকার করল রতন।

'শোন, সবাইকে বলে দে কেউ যেন মাড়োয়ারিকে জমি বিক্রি না করে। ওরা গ্রামের মানুষকে ঠকাচ্ছে।'

'ও মা? তাই নাকি। তোমার নাম করে বলব তো?'

'হ্যাঁ, তাই বল।' লাইন কেটে গগন ফেরত দিল মোবাইল।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ গগন। খুব ভাল খবর দিয়েছ আমাকে।' সাংবাদিক বললেন, 'অবশ্য খবরটা আরও ভাল হবে যদি সরকার তোমাদের এলাকার জমি গ্রহণ করতে চান। সেটা আজ বিকেলেই জানতে পারব।'

আজ মালিককে বাড়িতে নামিয়ে গ্যারাজ করে বাগবাজারে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। তাকে দেখে রমাপ্রসাদদা চিৎকার করে ডাকল, 'এই গগন, শুনেছিস?'

'কী?' দোকানের সামনে দাঁড়াল গগন। এখন কোনও খদ্দের নেই।

'দারুণ খবর। বেঙ্কেমারি, শিবচরণপুর, বিজুরিতে বিশাল কারখানা তৈরি হবে। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ওখানে স্থানীয় ছেলেদের চাকরি হবে। একটা সাইকেলের মেরামতির দোকান যেখানে ছিল না সেখানে হাজার হাজার মোটরগাড়ি তৈরি হবে, মোটরসাইকেল তৈরির কারখানা হবে। ভাবতে পারিস? আমি তো স্বপ্নেও এ সব চিন্তা করতে পারিনি।'

'তুমি শুনলে কোথায়?'

আমারবই.কম

'আরে টিভিতে বারংবার বলছে। ঘরে গিয়ে টিভি খোল, তুইও শুনতে পারবি।'

'ব্যাপারটা হলে কিন্তু আমাদের এলাকার চেহারা বদলে যাবে।' বেশ খুশি হয়ে বলল গগন, 'অনেক ছেলের চাকরি হয়ে যাবে ওখানেই।'

ঘরে এসে দেখল বউদি টিভিতে বাংলা সিরিয়াল দেখছে। সে বলল, 'শুনেছ, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আমাদের ওখানে বড় বড় কলকারখানা হবে!'

সিরিয়াল দেখতে দেখতে বউদি বলল, 'বেল পাকলে কাকের কী!'

'তার মানে?'

'তোমার কাকা তো তার ভাগের জমি অনেক আগে বিক্রি করে এখানে মুদির দোকান খুলেছে। বাকি জীবন ওই মুদির দোকানই আমার ভরসা। গ্রামের খবর জেনে আমি কী করব!' বউদির কথাগুলো বড্ড চাঁচাছোলা, নিজের না হোক, অন্যের ভাল হচ্ছে দেখলেও তো খুশি হয় অনেকে।

পরদিন গাড়িতে বসে মালিক বললেন, 'তুমি তো বিখ্যাত হয়ে গেলে গগনচন্দ্র।'

'বুঝলাম না স্যার।' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল গগন।

'আজকের খবরের কাগজে তোমার নাম ছাপা হয়েছে। সুমন্ত্রবাবু তোমার কথা লিখেছেন। তোমার কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন।'

ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হল গগন। মালিককে তাঁর অফিসে নামিয়ে সে গণকণ্ঠ কাগজটা কিনে ফেলল। প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা, 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। পশ্চিমবাংলায় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করবেন শিল্পপতিরা। তার নীচে খবরটা বিশদে লেখা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপতি প্যাটেল গোষ্ঠী বিজুরিতে পাঁচ হাজার কোটি বিনিয়োগ করে স্বল্প দামের মোটরগাড়ির কারখানা তৈরি করবেন। সেই সঙ্গে মালয়েশিয়ার অন্যতম শিল্পপতি শিবচরণপুর এবং রানিহাটে ইস্পাত এবং মোটরসাইকেল তৈরির কারখানা করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মূলত একফসলি জমি শিল্পের জন্যে অধিগ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত

স্তর থেকে আলোচনার জন্যে জেলাশাসক এবং মহাকুমাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই খবরের নীচে আর একটি হেডলাইন দিয়ে খবর ছাপা হয়েছে। 'জমি নিয়ে জালিয়াতি।' সরকারি সিদ্ধান্তের কথা আগাম জেনে ফেলায় একটি অসৎ সংস্থা প্রস্তাবিত শিল্প-এলাকার জমি কিনে নিচ্ছিল। জলের দামে কেনা জমি সরকারকে বেশি দামে বিক্রি করার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। শিবচরণপুরের যুবক গগনচন্দ্র এই ষড়যন্ত্রের কথা গণকণ্ঠের সাংবাদিককে প্রথমে জানান। ইত্যাদি। নিজের নামটা আর একবার ছাপার অক্ষরে দেখল গগন। গণকণ্ঠ খুব অল্প হলেও শিবচরণপুরে পৌঁছায়। তার মানে কিছু লোক খবরটা পড়বে এবং মুখে মুখে তার নাম ছড়িয়ে যাবে। খুব খুশি হল গগন।

গাড়ি চালাবার ফাঁকে ফাঁকে ভাবনাটা মাথায় আসে। সারা বছর খেটেখুটে জমি থেকে যে ধান শেষ পর্যন্ত ঘরে আসে তা কিছুই নয়। সেই জমি যদি শিল্পের প্রয়োজনে ভাল দাম দিয়ে সরকার গ্রহণ করে তা হলে তো আপত্তির কিছু নেই। মাড়োয়ারিদের কাছে বিক্রি না করে সরকারকে বিক্রি করলে দেশের লাভ হবে।

গগন ভাবে, তাদের জেলার ওই এলাকায় কোনও কলকারখানা ছিল না। বেকার ছেলেদের কাজ পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ভক্তহাটের মোটর ট্রেনিং স্কুল থেকে ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স বের করে কলকাতায় আসামাত্র কেউ তাকে চাকরি দেয়নি। সবাই লাইসেন্সের বয়স জানতে চায় স্বাভাবিকভাবেই। প্রথমে পার্ট টাইম ট্যাক্সি চালাতে হয়েছিল তাকে। জীবনের ভয়ঙ্কর দিকটা তখন সে দেখেছিল। পুলিশ-গুন্ডা-ট্যাক্সি মালিকের হৃদয়হীনতা দেখেও সে হাল ছাড়েনি। কিন্তু তার মতন কয়জন গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল? বারো ক্লাশের পর পড়াশুনা ছাড়তে হয়েছিল অভাবের জন্যে। বেশির ভাগ ছেলেকেই তাই করতে হয়। কিন্তু তারপর যারা গ্রামে থেকে যায় তাদের সামনে কোনও আলো থাকে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ তাদের আলো দেখাবে। এত সব কারখানা তৈরি হবে, নিশ্চয়ই স্থানীয় ছেলেরা কাজের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে। বেকার সমস্যা কমে যাবে তাদের এলাকায়।

গগন খুশি হয়। সরকারি চাকরিটা না পেলেও আর আফশোস নেই। দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীরা বড় বড় কারখানা যখন করছে তখন প্রচুর গাড়ি

আমারবই.কম

থাকবে এবং সেগুলো চালাবার জন্যে ড্রাইভারের দরকার পড়বেই। পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেলে তার চাকরি পাওয়া নিশ্চিত। বড় কোম্পানিতে চাকরি মানে অনেক বেশি মাইনে।

পরের শনিবার মালিক তাড়াতাড়ি ছুটি দিতেই সে ভক্তহাটের বাস ধরল। ক্ষুদিদার দোকানে সাইকেলের সংখ্যা এখনও অনেক। রাত বেশি হয়নি বলেই ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা ফিরে আসেনি। কিন্তু কারও কৃপার জন্যে না দাঁড়িয়ে সে হাঁটা শুরু করতেই বিকাশকে দেখতে পেল। সাইকেলের ওপর বসে পার্টির দু'জন কর্মীর সঙ্গে কথা বলছে' তাকে দেখতে পেয়ে বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে গগন, তুই তো ফাটিয়ে দিয়েছিস?'

হকচকিয়ে গেল গগন, 'মানে?'

'তোর নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। আমাদের গ্রামের কারও নাম এই প্রথম ছাপা হল। তার আগে অবশ্য রতন তোর কথা মতো জব্বর প্রচার চালিয়েছে। এই ভক্তহাটে মাড়োয়ারিদের যে অফিস ছিল সেটা সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।' বিকাশ বলল।

'ওরা আগেভাগে খবর পেয়ে গ্রামের লোকের অভাবের সুযোগ নিচ্ছিল।'

'তা আর কী করা যাবে! ওরা কিনতে চেয়েছিল, যারা বিক্রি করেছে তারা না করতে চাইলে জোর করে নিয়ে নিতে পারত না।' বিকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি যাবি তো?'

'হ্যাঁ।'

'উঠে পড়।'

সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসল গগন। বিকাশ বলল, 'আমরা বেকার ছেলেদের লিস্টটা নতুন করে করছি। অবশ্য দেরি আছে। আগে জমি নেবে, কারখানা তৈরি হবে, যন্ত্রপাতি বসবে, তারপর ইন্টারভিউ নিয়ে ট্রেনিং দেবে।'

'স্বপনদা কী বলছেন?'

'স্বপনদা!' বলে চুপ করে গিয়ে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল বিকাশ।

'কী হল?'

'খুব সতর্ক। চট করে মন্তব্য করছে না। আসলে বয়স হয়েছে তো!' বিকাশ বলল।

'যাঃ। স্বপনদার আর কত বয়স?'

'দ্যাখ গগন, সব কিছুকে সন্দেহ করা ঠিক নয়। এই দ্যাখ, আমাদের পার্টি একসময় প্যাটেলদের বুর্জোয়া বলত, তাদের ছায়া মাড়াত না। বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মেলাবার কথা ভাবতেই পারত না। তখন পরিস্থিতি ওরকম ছিল। কিন্তু অতীত আঁকড়ে থাকলে ভবিষ্যতের দিকে এগোনো যাবে না। বুর্জোয়া-পুঁজিপতিদের তো সবটাই খারাপ হতে পারে না। আমাদের শর্ত বজায় রেখে তাদের ভালটুকু যদি ব্যবহার করতে পারি তা হলে তা করব না কেন? আমরা আগে মিটিঙে মিছিলে গণসংগীত গাইতাম। সেই সব গান সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টকে স্পর্শ করে না। আমাদের সঙ্গে বেশ দূরত্ব তৈরি হত। ভোট দিত কারণ বিরোধীরা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। এখন আমরা রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলালের গান গাইছি। সেই সব গান সাধারণ মানুষও গায়। ফলে আমরা এখন সাধারণ মানুষের বন্ধু। তাই কিনা? স্বপনদারা এখনও খুঁতখুঁতানিতে আছেন। ওঁর মাথায় ঢুকেছে আজকালকার কারখানা অশিক্ষিত শ্রমিকদের কায়িক শ্রমে চলে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয় বড় কারখানায়। দশটা মানুষের কাজ একটা যন্ত্র করে দেয়। সেই যন্ত্র চালাবার দক্ষতা থাকলে কারখানায় কাজ পাওয়া যাবে। অতএব এখানে কারখানা স্থাপিত হলেই গ্রামের আনস্কিল্ড ছেলেরা চাকরি পাবে এমন ভাবার নাকি কোনও কারণ নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন প্যাটেল এবং মালয়েশিয়ান শিল্পপতির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে যে যাদের জমিতে কারখানা হবে তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে। দরকার হলে কারখানা খোলার এক বছর আগে ওদের নির্বাচিত করে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে যাতে কারখানা চালু হলে কোনও অসুবিধে না হয়।'

গগন চুপচাপ শুনে গেল। ব্যাপারটা তো তার মাথায় ঢোকেনি। মালিকের অফিসে একসময় যত লোক কাজ করত বলে সে শুনেছে এখন তার সিকি অংশের বেশি প্রয়োজন হয় না। কম্প্যুটারের ব্যবহার নাকি সেই খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছে, সময়ও কমিয়েছে। তার তুলনায় ওই সব কারখানা নিশ্চয়ই অনেক বেশি আধুনিক হবে। যত আধুনিক তত মানুষের প্রয়োজন কম হবে।

বেঙ্কেমারির বটগাছের কাছে এসে বিকাশ গতি কমাল, 'দু'পাশেই তো সব ফসলি জমি। কারখানার জন্যে জমি নিলে এই গাছটাকে নিশ্চয়ই কেটে ফেলবে।'

আমারবই.কম

গগন কথা বলল না। সে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাতের বেলায় এই গাছটার কাছে এলে ও সব নিয়ে ভাবতেও ইচ্ছে করে না।

গাছ পেরিয়ে এসে বিকাশের গলার স্বর বদলে গেল, 'বাড়িটা চিনে এসেছিস?

'কার বাড়ি?' গগন বুঝতে পারল না।

'ভ্যাট! ন্যাকামো করিস না। কুসুমদের বাড়িতে তুই যাসনি?' বিকাশ জিজ্ঞাসা করল।

'না। খামোকা অচেনা একটা মেয়ের বাড়িতে যেতে যাব কেন?' গগন বিরক্তি দেখাল।

'অচেনা কোথায়? আমি তো পরিচয় করিয়ে দিলাম। একসঙ্গে বসিসনি তা দেখেছি, ওর ভাড়াটা নিশ্চয়ই দিসনি?'

'দিতে চাইনি, কন্ডাক্টার চেয়ে নিয়েছে।' গগন বলল।

'তারপর? কলকাতায় বাস থেকে নেমে কী করলি?'

'আমি বাগবাজারে চলে গেলাম।'

'আর কুসুম?'

'আশ্চর্য! যে মেয়ে একাই এখানে এসেছে, সে নিশ্চয়ই একা বাড়ি ফিরে গেছে।'

'না না না। তোর উচিত ছিল ওকে পৌঁছে দেওয়া।'

'কেন? উচিত ছিল কেন?'

'আচ্ছা, ও আফটার অল স্বপনদার ভাগ্নি।'

'স্বপনদাকে যে অপছন্দ করে সে ভাগ্নি হলেও আমার কিছু করার নেই। তোর যখন এত দরদ, তখন তুই পৌঁছে দিতে যাসনি কেন?' রেগে গিয়ে বলল গগন।

বাকি পথটা কেউ কথা বলল না। গাঁয়ে ঢুকে বিকাশ সাইকেল দাঁড় করাতেই গগন নেমে পড়ল। বিকাশ জোরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

বাড়ি হয়ে যদুনাথের কাছে গেল গগন। তাকে দেখেই খেপে গেলেন যদুনাথ, 'শহরে গিয়ে তুমি খুব চালাকচতুর বলে নিজেকে ভেবে নিয়েছ?'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'তোমার কি দরকার ছিল রতনকে ফোন করে সবাইকে জানিয়ে দিতে যেন

কেউ জমি বিক্রি না করে? কিছু মানুষ, গরিব মানুষ, টাকা পেত, তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি টাকাটা থেকে বঞ্চিত করলে।' যদুনাথের গলার স্বর চড়া।

'ওই মাড়োয়ারিরা প্রতারণা করছিল আমাদের, এ কথা জানানো দরকার ছিল।'

'খবরের কাগজে নাম উঠেছে বলে তুমি যদি নিজেকে নেতা ভাবতে আরম্ভ করো তুমি ভুল করবে গগন। আমাদের সরকারের কত টাকা আছে? কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। উন্নয়নের কাজ আটকে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষে এত জমির দাম দেওয়া অসম্ভব। তুমি মানুষের মনে লোভ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত সরকারবিরোধী করে তুলতে চাও। আমি তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব।' যদুনাথ বললেন।

'আমি যদি আপনার কথামতো মা'কে বলি জমিটা বিক্রি করতে তা হলে নিশ্চয়ই আপনি খুশি হতেন?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তো বারংবার সে কথাই বলেছি। যা দাম পাচ্ছ তা কেউ তোমাকে দেবে না। তুমি রাজি হলে আমিও বেশি দাম পাব।'

'বেশ তাই হোক। আপনি কথা বলুন।'

যদুনাথ হাসলেন, 'তোমাকে বকুনি দিলাম বলে কিছু মনে কোরো না। আমি তো তোমার ভাল চাই। আমার যা কিছু সবই তো তোমাদের জন্যে।' যদুনাথ বললেন।

গগন আর দাঁড়াল না। যদুনাথের কথা শুনে তার বুঝতে অসুবিধে হল না যে তিনি মাড়োয়ারিদের হালফিল খবর রাখেন না। সম্ভবত ব্রজকিশোর ইদানীং তাঁর কাছে আসেননি। এই গ্রামের পঞ্চায়েতও ঢিমেতালে চলে। কয়েক দিনের মধ্যে বোধহয় কোনও মিটিং হয়নি। ভক্তহাটের মাড়োয়ারিদের অফিস যে বন্ধ হয়ে গেছে, জমি কেনার জন্যে সেখানে কেউ বসে নেই, এ কথা জানা থাকলে ওঁর রাগ এবং আফশোস দ্বিগুণ হত। লোকটাকে শান্ত রাখার জন্যে সে সম্মতি দিয়ে এল। সেটা আর বাস্তবে ঘটা সম্ভব নয় যখন তখন মিথ্যাচার করতে দোষ কোথায়!

বাড়ি ফিরছিল গগন। এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। রাস্তায় যতীনদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যতীন একা নেই, ওর সঙ্গে দলের তিনজন আছে। এই গ্রামে পার্টির বিরোধী দল করেও ভোটে সাফল্য পায় না ওরা। তাকে দেখে যতীন জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলি?'

আমারবই.কম

‘এই তো একটু আগে।’

‘সিগারেট চলবে?’

‘না রে।’

‘তুই হঠাৎ তোদের পার্টির বিরোধী হয়ে গেলি কেন?’

‘আমি? বিরোধী? কী থেকে বুঝলি?’ অবাক হল গগন।

‘তোদের পার্টির নেতারা গ্রামের গরিব মানুষগুলোকে মাড়োয়ারির হাতে জমি তুলে দিতে উস্কানি দিচ্ছিল। সত্যি বলতে কী আমরা এর পেছনের কারণটা বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ তুই খবরটা কলকাতার কাগজে ফাঁস করে দিলি, টেলিফোন বুথের রতনকে বললি সবাইকে জানিয়ে দিতে যাতে কেউ জমি বিক্রি না করে—, এটা তো নেতাদের বিরোধিতা করা। এখনও কেউ তোকে কিছু বলেনি?’ যতীন জিজ্ঞাসা করল।

‘যদুকাকা বলেছে। কিন্তু আমি তো কখনও সক্রিয়ভাবে পার্টি করিনি।’

‘করিসনি। কিন্তু সবাই জানে তুই মরে গেলেও আমাদের ভোট দিবি না। পঞ্চায়েতে পার্টির নমিনেশন পেয়েও তুই নিসনি বলে লোকে তোকে অন্য চোখে দ্যাখে। আবার সেই লোকজন এখন বলছে, মানে যারা ইতিমধ্যে জমি বিক্রি করে টাকা নিয়েছে, বলছে তুই সব গোলমাল করে দিচ্ছিস। সাবধানে থাকিস।’ যতীন বলল।

হাসল গগন, ‘দ্যাখ যতীন, আমি যা ভাল মনে করেছি তা করেছি। এর জন্যে সাবধানে থাকার কী আছে। যদুনাথকাকা—।’

হাত তুলে গগনকে থামাল যতীন, ‘ওই হারামিটার নাম করিস না গগন।’

গগন রেগে গেল, ‘গালাগাল করছিস কেন? কেন হারামি বললি?’

‘শালা জমির দালালি করেছে। ওই ব্রজকিশোরকে দিয়ে মাড়োয়ারিকে জমি পাইয়ে দিয়ে কমিশন ঝাড়ছে। সব খবর আমাদের কাছে আছে।’ যতীনরা চলে গেল।

একটা বিশ্রী অনুভূতি হল গগনের। এই গ্রামে কখনও গণ্ডগোল হয়নি। নির্বাচনের সময় মিটিং, মিছিল হয়েছে, পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু কখনওই মারপিট হয়নি, বোমা বা গুলি দূরের কথা। এই যে যদুনাথকে যতীন হারামি বলে গেল, এমন কথা বয়স্কদের সম্পর্কে আগে কেউ বলত না। যদুনাথের মুখ মনে পড়ল। লোকটা তাদের পরিবারের

পাশে একসময় দাঁড়িয়েছিল। বাবার অভাবের সময় জমি বিক্রি করিয়ে টাকা দিয়েছিল। সেই জমি যদি বেনামে যদুনাথ কিনে থাকেন তা হলে বাবার কিছু বলার ছিল না কারণ টাকাটা খুব জরুরি ছিল। কিন্তু ব্রজকিশোরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের এক ফসলি জমি মাড়োয়ারিকে বিক্রি করে কমিশন খাচ্ছেন এটা গগন জানত না। আজ তার নামে পার্টির কাছে নালিশ করার ভয় দেখিয়েছেন কিন্তু যেই শুনলেন গগন তাঁর প্রস্তাবে রাজি অমনি চেহারা বদলে ফেললেন। হাঁটতে হাঁটতে গগনের মনে হল যতীনের কথাটা ভুল নয়। সে শব্দটা উচ্চারণ করল, ‘হারামি।’

ভক্তহাটের পার্টি অফিসে একটা সার্কুলার এল। স্বপন ছিলেন না পার্টি অফিসে। গতকাল কলকাতায় গিয়েছেন, আজ বিকেলে ফেরার কথা। সার্কুলার পাঠিয়েছেন পাশের মহকুমার সাংসদ। এই জেলায় পার্টির ভিত তৈরি করতে তিনি যা করেছেন তা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ফলে পার্টির উঁচু মহলেও তাঁর বেশ খাতির। সাংসদ বটে কিন্তু এখনও রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী বা সেন্ট্রাল কমিটিতে তাঁর জায়গা হয়নি। না হোক, এই জেলায় তাঁর ইচ্ছেই শেষ কথা। নিজের এলাকায় তিনি নানান কর্পোরেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলে জনসেবা করে চলেছেন।

সার্কুলারে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের উন্নতি প্রকল্পে সরকার যে সচেষ্ট হয়েছেন, তা ইতিমধ্যেই জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছে। আজ বিশ্বায়নের যুগে দেশ শিল্পের নিরিখে পিছিয়ে থাকতে পারে না। দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা সরকারের আহ্বানে বিপুল পুঁজি নিয়ে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শিল্প তো হাওয়ার ওপর স্থাপন করা সম্ভব নয়। তার জন্যে জমি দরকার। এই জমি যদি বন্দরের কাছাকাছি না হয় তা হলে আমদানি-রপ্তানির কাজ ব্যাহত হবেই। এই কারণে সরকার বেঙ্কেমারি, শিবচরণপুর, বিজুরি এবং রানিচকের অনাবাদি অথবা একফসলি জমি অধিগ্রহণ করতে চাইছেন। এই অধিকৃত জমিতে শিল্প স্থাপন হলে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বদলে যেতে বাধ্য। অসংখ্য বেকার ছেলেমেয়ে চাকরি পাবেন।

ভক্তহাটের পার্টি অফিস থেকে এই সার্কুলার মাইকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে গেল। লিফলেট ছাপা হল। ক্ষুদিদার দোকান রবিবারে বন্ধ। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি আধাপাগলা লোক চিৎকার করতে শুরু করল, ‘আসছে,

আমারবই.কম

আসছে, শিল্প আসছে। দারুণ খবর। দারুণ খবর।'

বিকেলবেলায় কলকাতা থেকে ফিরে সার্কুলার দেখে স্বপন হতবাক। সে সহকারী সম্পাদককে ডেকে বলল, 'তোমরা এটা প্রচার করেছ?'

'হ্যাঁ। দাদার সার্কুলার, তাই—। কোনও ভুল হয়েছে?'

'অধিগ্রহণ মানে কী?' স্বপন উত্তেজিত হল, 'বলো তোমরা, লোকে যখন জিজ্ঞাসা করবে অধিগ্রহণ মানে কী তোমাদের জবাব কী হবে? তা ছাড়া এত বড় ব্যাপার একজন সাংসদের সার্কুলারে সম্ভব হতে পারে না। এটা ডি এম যদি দিতেন তা হলে বৈধ হত। কারণ তিনি এই এলাকায় সরকারের প্রতিনিধি।' মাথা নাড়লেন স্বপন, 'তোমরা আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না?'

'আপনি কলকাতায় নেতাদের কাছে কিছু শোনেননি?'

'না।'

টেলিফোনে সাংসদকে ধরার চেষ্টা করলেন স্বপনদা। শুনলেন তিনি এখন দিল্লিতে। দিল্লির নাম্বার ডায়াল করলেন তিনি। সাংসদকে পাওয়া গেল। পি এ স্বপনের নাম শুনে রিসিভার দিলেন তাঁকে। স্বপন বলল, 'আপনার পাঠানো সার্কুলার এই মাত্র দেখলাম। আমি ছিলাম না, এখান থেকে ছেলেরা ইতিমধ্যে প্রচার করে ফেলেছে।'

'তো? দোষটা কী করল?'

'এটা তো সরকারি সার্কুলার নয়।'

'ও। আচ্ছা স্বপন, সরকার কারা চালাচ্ছে? আমরা। তাই না? জনসাধারণের কাছে আমরাই যাব। সরকারি আমলারা কবে কী করবে তার জন্যে আমি বসে থাকব কেন? এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বিচলিত হয়ে দিল্লিতে ফোন করার কোনও যুক্তি নেই।' ফোন রেখে দিলেন সাংসদ। স্বপন কয়েক সেকেন্ড দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকল।

বেঙ্কেমারি, শিবচরণপুর, বিজুরি আর রানিচকের কিছু মানুষ যারা মাড়োয়ারি সংস্থার কাছে জমি বিক্রি করেছিল তারা উল্লসিত হল। খুব অবাক হয়ে গেল বাকিরা যারা জমি বিক্রি করেনি। তাদের জমি সরকার অধিগ্রহণ করবে। অধিগ্রহণ মানে কী? যে যেমন পারে অর্থ তৈরি করতে লাগল। কেউ বলল, সরকার ইচ্ছে করলে যে কোনও নাগরিকের সম্পত্তি দেশের প্রয়োজনে দখল করে নিতে পারে। উন্নয়ন তো দেশের প্রয়োজনেই হচ্ছে।

তাই জমির দখল নেওয়ার সময় সরকারকে দাম দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর এক দল বলল, সরকার জমি যেমন নেবে তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী দাম দেবে। একেবারে গ্রামবাসীকে বঞ্চিত করবে না। মানুষ আতঙ্কিত হল। সরকার যদি বিঘে প্রতি আড়াই হাজার টাকা দেয় তাই নিতে হবে। তা ছাড়া সরকারি টাকা কবে পাওয়া যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। পতঙ্গপুরের দু'জন স্কুল মাস্টার দশ বছর আগে অবসর নিয়েছেন, এখনও প্রাপ্য টাকা সরকারের কাছ থেকে পাননি। বেলা বাড়ার পর আর একটা আশঙ্কার কথা চাউর হল। সরকার এখন এক ফসলি জমি অধিগ্রহণের কথা বলছে বটে কিন্তু তার আয়তন কতটুকু? কারখানার এক ভাগ শিবচরণপুরে, অন্য ভাগ বিজুরিতে হওয়া তো সম্ভব নয়। একই জায়গায় কারখানা করতে হলে দু'ফসলি জমিতেও হাত বাড়াতে হবে সরকারকে। আর একবার দু-ফসলি জমি নিতে আরম্ভ করলে আর দেখতে হবে না।

কেউ কেউ চিৎকার করতে লাগল, সরকার কেন? যারা কারখানা তৈরি করবে তারা এসে আমাদের কাছ থেকে জমি কিনুক। পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে জমির দাম ঠিক করুক। উৎপাদন তো ওরাই করবে, সরকার নয়। এর জবাবও তৈরি হয়ে গেল। সরকার কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে শিল্পপতিদের লিজ দেবে, বিক্রি করবে না। পঞ্চাশ বা নিরানব্বুই বছরের লিজ। শিল্পপতিরা সেক্ষেত্রে জমির মালিক হচ্ছে না।

একটু বেলা বাড়তেই যতীনরা মিছিল বের করল শিবচরণপুরে। শ্লোগান উঠল, 'শিল্পের নামে জমি দখল মানব না মানছি না। জমি নিয়ে ভাঁওতাবাজি চলবে না চলবে না।' বিরোধী দলের জমায়েতে তখন মাত্র জনা আটেক লোক। কিন্তু যেই মিছিল শিবচরণপুরের রাস্তায় নামল অমনি দেখা গেল এক দুই করে সংখ্যা বাড়ছে। শেষপর্যন্ত যতীন হাঁকল, 'প্রাণ দেব তবু জমি দেব না।' মিছিলের মানুষের সংখ্যা তিরিশ ছাড়িয়ে গেল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গগন দেখছিল। দূর থেকে মিছিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন। বিরোধী দলের মিছিলে এত লোক কখনও হয় না।

যদুনাথ এগিয়ে এলেন, 'এ সব কী হচ্ছে গগন?'

গগন দেখল মানুষটাকে। বোঝা গেল বেদম রেগে গেছেন। সে বলল, 'তাই তো ভাবছি।'

'ভাবছ? তুমি ন্যাকা, কিছু জানো না?'

আমারবই.কম

'বিশ্বাস করুন, সারা সকাল বাড়ি থেকে বেরুইনি।'

'বিশ্বাস করি না। তুমি সব জানো। ভক্তহাটের জমি কেনার অফিস বন্ধ হয়ে গেছে জেনেছ বলে কাল আমাকে টোপ দিয়ে গেলে! তুমি গত রাত্রে যতীনের সঙ্গে গল্প করোনি? হ্যাঁ কি না?'

'আপনার বাড়ি থেকে ফেরার সময় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'তার মানে তুমি জানো ওরা আজ মিছিল বের করবে।'

'না। বাজে কথা বলছেন।'

'কী? আমার মুখের ওপর এ কথা বলার সাহস পেলে তুমি?'

'সাহস তো আপনি জুগিয়ে দিচ্ছেন। সবাই বলাবলি করছে যে আপনি লোকদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জমি বিক্রি করিয়ে মাড়োয়ারিদের কাছ থেকে কমিশন নেন।'

যদুনাথের চোয়াল ঝুলে পড়ল। কিন্তু তিনি দ্রুত সামলে নিলেন। চাপা গলায় বললেন, 'আজ থেকে তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আমার নেই। শুধু আমার সঙ্গে কেন, আমাদের পার্টি তোমাকে ত্যাগ করল। আমাদের কোনও কাজে তুমি আসবে না এবং আমরা তোমাকে পার্টিবিরোধী বলে চিহ্নিত করব।'

যদুনাথ কথাগুলো শেষ করতে না করতে মিছিল এসে গেল সামনে। রাস্তার দু'পাশে মানুষ তাদের দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে। যদুনাথকে দেখা মাত্র যতীন চিৎকার করল, 'বেইমানদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও। মাড়োয়ারির চামচের মুখোশ খুলে দাও খুলে দাও।'

যদুনাথ দ্রুত তাঁর বাড়িতে ঢুকে গেলেন। মিছিলের মানুষের সংখ্যা এখন পঞ্চাশ।

বাড়িতে ফিরে এল গগন। মা-ও আড়াল থেকে মিছিল দেখছিল। গগনকে ফিরতে দেখে উঠোনে এসে বলল, 'এ সব কী হচ্ছে রে!'

'বুঝতে পারছি না মা।'

'তোদের পার্টির উচিত এখনই এসে সবাইকে বুঝিয়ে বলা। ওরা তো মানুষের ক্ষতি চায় না। কিন্তু সরকার যদি জোর করে জমি নিতে চায় তা হলে তো সবাই প্রতিবাদ করবে। তোর কি মনে হয় সরকার জোর করে জমি নেবে?' মা উদ্বিগ্ন।

'আমার বিশ্বাস হয় না। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।'

'তোকে যদুঠাকুরপো কী বলছিল?'

'ওঁর ধারণা আমি নাকি যতীনদের উস্কে দিয়েছি। আসলে আমি ওর কথা মতো তোমাকে জমি বিক্রি করতে দিইনি বলে খুব খেপে গেছেন। যারা জমি কিনছিল তারাও এখন হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ক'দিন থেকে উনি জমি বিক্রি করার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। কাল রাত্রে শুনলাম জমি বিক্রি করাতে পারলে উনি কমিশন পাবেন। পেয়েওছেন।'

'সে কী রে? যদুঠাকুরপো পঞ্চায়েতের সদস্য হয়েও এই কাজ করছেন?'

'সেটা ওঁর মুখের ওপর বলায় প্রতিবাদ করতে পারেননি।'

'তুই এ সবের মধ্যে আর থাকিস না। দুপুরেই কলকাতায় চলে যা।'

'কেন?'

'কোত্থেকে কী হবে তা কেউ বলতে পারে?'

এই সময় বাইরে চিৎকার হচ্ছে শুনে গগন পা বাড়াল।

পার্টির ছেলেরা মিছিল বের করেছে। গগন গুনল, এগারোজন। বিকাশ ওদের নেতৃত্বে। বিকাশ চিৎকার করছে, 'এলাকার সার্বিক উন্নতির জন্যে শিল্প চাই— শিল্প চাই। এই শিল্পের জন্যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না হবে না।'

কিন্তু রাস্তার দু'ধারে যারা আবার এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। গগনকে দেখে বিকাশ ডাকল, 'অ্যাই গগন, চলে আয়।'

'ভাবছি।' গগন জবাব দিল।

'ভাবছিস মানে? ওরা মওকা লোটার চেষ্টা করছে, বাধা দিতে হবে।' বলতে বলতে বিকাশ বাকিদের নিয়ে এগিয়ে যেতেই যদুনাথ প্রায় লাফিয়ে মিছিলে যোগ দিলেন। দিয়েই চিৎকার করলেন, 'দেশের শত্রু কারা শিল্প চায় না যারা।' সঙ্গে সঙ্গে সেটাই স্লোগান হয়ে গেল মিছিলের। 'দেশের শত্রু কারা শিল্প চায় না যারা।'

সারা দিন ধরে শ্লোগান শোনা গেল। শিবচরণপুরে শুরু হয়েছিল, ছড়িয়ে গেল বেন্ধেমারিতে। বিজুরিতে বিরোধী দলের কোনও সংগঠন নেই। যারা সমর্থক তাদের শক্তি দুর্বল। তাই বিজুরি চুপচাপ থাকল।

সন্ধের মুখে বাড়ি থেকে বের হল গগন। ছোটভাই কার কাছ থেকে আজ সাইকেল জোগাড় করে এনেছে, গগনকে ভক্তহাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে। গগন বেশ অবাক হয়েছিল। এর আগে কখনও এমন কাজ করার কথা ভাই-এর মাথায় আসেনি।

আমারবই.কম

বাড়ি ছেড়ে একটু এগিয়ে সে ক্যারিয়ারে বসা ভাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে সাইকেল আনতে কে বলেছে?'

যে শব্দটা ওর মুখ থেকে বের হল সেটা একটু স্পষ্ট হলে মা শোনাত। গগন হাসল। আজ মা-ও তার জন্যে ভয় পাচ্ছে।

বেহ্মোমারির বটগাছটা পার হওয়ার আগেই সন্ধেরাত। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ফেরার সময় এখান দিয়ে যেতে ভয় পাবি না তো?'

ভাই বোঝাল সে ভয় পাবে না।

'ও সব ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। মানুষই মনে মনে কল্পনা করেছে। অবশ্য এখান থেকে ভক্তহাট বেশি দূরে নয়। তুই বরং এখান থেকেই ফিরে যা।'

ছেলেটা তীব্র প্রতিবাদ করছিল। কিন্তু গগন সাইকেল থেকে নেমে পড়ল, 'এখান থেকে আমি যেতে পারব। তুই চলে যা।'

ভাই তবু রাজি হচ্ছিল না। গগন ওর কাঁধে হাত দিল, 'শোন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও মিছিল মিটিঙে যাবি না। যা।'

গগন হাঁটতে আরম্ভ করল। বাঁকের মুখে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল ভাই-এর আবছা চেহারা তখনও দেখা যাচ্ছে। সে চিৎকার করল, 'চলে যা।'

এই রাস্তা পিচ দিয়ে বাঁধানো হবে, আলো দেওয়া হবে। বোধহয় ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে গগন। যে কোনও নির্বাচনের আগে পার্টির তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং পরে টাকার অভাব দেখানোটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভক্তহাটে যখন সে পৌঁছাল তখনও দুটো বাসের কলকাতায় যাওয়ার কথা। হাতে সময়ও আছে। এই সময় রবিদাকে দেখতে পেল সে। রবিদা পার্টির একজন সিনিয়ার কর্মী। কখনও কোনও নির্বাচনে দাঁড়াননি। বললে বলেন, আমি ভাই নিচুতলার লোক, এখানেই থাকতে চাই। রবিদা দু'জনের সঙ্গে খুব গম্ভীর মুখে কথা বলছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলতে গগন এগিয়ে গেল।

রবিদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ?'

'আছি। কলকাতায় চাকরি করি।'

'হ্যাঁ জানি। তা এ দিকে আসো যখন তখন পার্টি অফিসে যাও না কেন? তা হলে দেখা-টেখা হয়।' রবিদা বললেন।

'গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম। স্বপনদার কাছে।'

'ও। স্বপনের কথা শুনেছ?'

'না। কী হয়েছে?'

'স্বপন ওর পদ থেকে রেজিগনেশন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পার্টির কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছে। খুব খারাপ ব্যাপার। নিজের হাতে এলাকাটা তৈরি করেছিল ও।'

'সর্বনাশ। এরকম হল কেন? স্বপনদাকে ছাড়া পার্টি আমি ভাবতেই পারছি না। এই সেদিনও তো কোনও আভাস দেননি।' গগন উত্তেজিত।

'স্বপন শুনলে বলবে কোনও বিশেষ ব্যক্তির ওপর পার্টির অস্তিত্ব নির্ভর করে না। যারা এরকম ভাবে তারা বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।' রবিদা আবার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা শুরু করলেন। তাঁদের আলোচনা যে স্বপনদাকে নিয়েই, তা বুঝে সরে এল গগন।

শেষ বাসটা আসতে এখনও চল্লিশ মিনিট বাকি আছে। গগন হাঁটতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে স্বপনদার সঙ্গে দেখা করে আসা সম্ভব। সে সোজা পার্টির অফিসে গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। কয়েকজন কর্মী সামনে দাঁড়িয়েছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল স্বপনদা তাঁর বাড়িতে চলে গেছেন।

বাড়িটা মিনিট পাঁচেক দূরে। গগন পৌঁছে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। স্বপনদাই সেটা খুলে তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আরে! কী খবর? এসো, এসো।'

'ভেতরে যাব না স্বপনদা। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিলাম। বাসস্ট্যান্ডে রবিদার কাছে খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না বলে ছুটে এলাম।'

স্বপনদা গগনের কাঁধে হাত রাখলেন, 'ঠিকই শুনেছ। আমি এখন কোনও পদে নেই।'

'কিন্তু কেন? আপনাকে ছাড়া পার্টির কথা ভাবাই যায় না।' গগন প্রতিবাদ করল।

'না। আমাদের পার্টিতে কেউই চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে দল তো পাথর হয়ে যাবে। তা নয়, আমি একজন সামান্য কর্মী হয়ে থাকতে চাই। কিন্তু উঁচু পদে থেকে পার্টির বিরুদ্ধে যেতে পারব না। কিছু দিন থেকেই আমার অসুবিধে হচ্ছিল। হঠাৎ এই

আমারবই.কম

অঞ্চলের এক ফসলি জমি কেন বিক্রি হচ্ছে, আমাদের স্থানীয় নেতারা সেই বিক্রির ব্যাপারে কেন উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তা বুঝতে পারছিলাম না। আমার অনুপস্থিতিতে সাংসদের যে সার্কুলার প্রচারিত হয়েছে সেটি ভুল বুঝতে জনসাধারণকে সাহায্য করবে। কে কী অর্থ করছে জানি না, সাধারণ মানুষের মনে হবে অধিগ্রহণ মানে সরকার জোর করে জমি দখল করবে। শিল্পের জন্যে জমি দরকার। সেটা মানুষকে বুঝিয়ে রাজি করাতে সময় লাগবে। হুট করে অধিগ্রহণের কথা বললে শত্রুতা তৈরি হবেই। পদ আঁকড়ে থেকে যেমন আমি দলের বিরুদ্ধে যেতে পারব না, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করাও সম্ভব নয়। আমার ভাল লাগছে তুমি চিন্তিত হয়ে ছুটে এসেছ বলে। ওহো, তুমিই তো এস টি ডি বুথে ফোন করে সবাইকে জানিয়েছ জমি মাড়োয়ারিকে বিক্রি না করতে!'

'হ্যাঁ। একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন—।'

'যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আচ্ছা এসো।'

নাকের ওপর দিয়ে শেষ বাস বেরিয়ে গেল। এমনিতেই ছুটির দিনে দোকানপাট বন্ধ, শেষ বাস চলে গেলে জায়গাটা শব-না-আসা শ্মশান হয়ে গেল। খুব আফশোস হচ্ছিল। যদি সে স্বপনদার সঙ্গে দেখা না করতে যেত তা হলে স্বচ্ছন্দে বাসটা ধরতে পারত। কাল ডিউটিতে না গেলে হাজারটা কথা শুনতে হবে। মালিক লোকটা খারাপ নয় কিন্তু না বলে কামাই করলে প্রচণ্ড খেপে যান।

অবশ্য উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। ভোরের প্রথম বাস ধরে গেলে কলকাতায় পৌঁছেই যদি সোজা সে মালিকের বাড়িতে চলে যায় তা হলে সময়টা রাখা যাবে। সেক্ষেত্রে স্নান-টান হবে না সারা দিন। ওসব না করে দিন কাটানোর অভ্যেস তার নেই। এক বাসে ওঠার আগে স্নান-টান শেষ করে ফেললে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। এ সব করতে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে শিবচরণপুরে। তিন তিন ছয় কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। কোনও উপায় নেই। গ্রামের দিকে হাঁটতে যেতেই রাস্তার বাঁকে একটা ছোট্ট ঘরে আলো জ্বলতে দেখে খেয়াল হল গগনের। ভক্তহাটের একমাত্র টেলিফোন বুথটা এখনও জেগে আছে। সে যদি বাগবাজারের বুথে ফোন করে রমাপ্রসাদদাকে সমস্যার কথা বলে দেয় তা হলে মন্দ হয় না।

একটা অল্পবয়সি ছোকরা চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছিল, গগনকে দেখে হাত নীচে নামাল, 'কোথায় করবেন?'

'কলকাতায়।'

'তাড়াতাড়ি করুন, দোকান বন্ধ করব।' বলে ছেলেটা বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

বস্তির মুখের টেলিফোন বুথ এনগেজড্। যত বারই ডায়াল করে একই শব্দ বাজে। সিগারেট শেষ করে এসে ছেলেটা বলল, 'ফোন বোধহয় খারাপ। কাল ট্রাই করবেন?'

'এই বুথটা কার?' রেগে গেল গগন।

'কেন? আপনার কী দরকার?'

'যা জিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তর দাও।'

'আগে অভয় মণ্ডলের ছিল, মাস ছয়েক হল আমরা চালাচ্ছি।'

'দ্যাখো ভাই, এই রাত্রে আমি এখানে ইয়ার্কি মারতে আসিনি। টেলিফোন ইমার্জিন্সি সার্ভিসের মধ্যে পড়ে। তুমি যদি এখানে বুথটা চালাতে চাও তা হলে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।' কথা শেষ করে রিডায়ালের বোতামটা টিপল গগন। এবার রিং হচ্ছে।

'হ্যালো! আমি গগনদা বলছি। আঃ। মুদির দোকানের মালিক রমাপ্রসাদদার ভাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাকাকে ডাক, জলদি!'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। গগন দেখল ছেলেটা গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে হেসে ইশারায় বোঝাল বেশি সময় লাগবে না।

'হ্যালো! গগন বলছি। লাস্ট বাস মিস করেছি। চেষ্টা করছি ফার্স্ট বাস ধরে যাওয়ার। কলকাতায় নেমেই ডিউটি যাওয়ার আগে তোমাকে ফোন করব। তুমি যদি আমার ফোন ন'টার মধ্যে না পাও তা হলে মালিককে ফোনে বলে দিয়ো আমার যেতে একটু দেরি হবে। ঠিক আছে? কী? তুমি কোত্থেকে শুনলে? সেকী! তা হলে কাল বাস চলবে না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, যদি চলে তা হলে আমি যাব। রাখছি।' রিসিভার নামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে?'

ছেলেটা মিটার দেখে বলল, 'ছয় টাকা।'

গগনের স্থির বিশ্বাস ও বেশি বলছে কিন্তু আর তর্ক করতে ইচ্ছে হল না। রাতটা খোলা আকাশের নীচে কাটানো যায় না। ভক্তহাটে পরিচিত যাঁরা

থাকেন তাঁদের বাড়িতে এই সময় যাওয়াটা অস্বস্তিকর। অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রমাপ্রসাদদার কথা ভাবতে লাগল সে। আজ রাত সাড়ে আট'টা নাগাদ রমাপ্রসাদদা শুনেছে এই এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ঘোষণা করায় আগামী কাল বন্ধ ডাকা হবে। বিরোধীদলের নেত্রী নাকি সমভাবাপন্ন দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। আলোচনার পরে টিভি এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে। বন্‌ধ হলে রাস্তায় বাস বের হবে না। যে পার্টিই বন্‌ধ ডাকুক মালিক গাড়ি গ্যারাজে রেখে দেন। অর্থাৎ কাল বন্‌ধ হলে তার ফিরে যাওয়ার তাড়া থাকছে না।

কিন্তু জমি অধিগ্রহণের খবর পৌঁছে গেছে কলকাতায়। তাই নিয়ে যদি বন্‌ধ ডাকা হয়, তা হলে সমস্যাটাকে হালকা চোখে দেখা ঠিক নয়। স্বপনদার মতো পার্টিতে নিবেদিত নেতা যদি প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন তা হলে পার্টির প্রথম শ্রেণির নেতারা কি এ নিয়ে ভাববেন না? মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দেবেন?

বেঙ্কেমারির বটগাছের কাছে আসতেই কেউ হাঁকল, 'কে যায়?'

অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রশ্নটা বটগাছের কোনও ডাল থেকে ভেসে আসেনি, এসেছে পাশের মাঠ থেকে। গগন দাঁড়াল, 'আমি গগন। শিবচরণপুরে যাচ্ছি। আপনি কে?'

'তাই বল। অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। মাঠের ভেতর চলে আয় গগন। আমি যতীন।' যতীনের গলায় এখন আর সন্দেহ নেই। গগন অবাক হল। এই অন্ধকারে মাঠের ভেতর যতীন কী করছে?

কৌতূহলী হয়ে গগন মাঠে নামল। এবড়ো খেবড়ো জমি। কোনওক্রমে দূরত্ব কমালে গগন দেখল একটা তালগাছের নীচে কয়েকজন বসে আছে। কারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

যতীন বলল, 'বসে পড়। এখন এখান দিয়ে কেউ যাবে না ওই বটগাছটার ভয়ে। নির্জনে আলোচনা করা যাবে বলে আমরা এখানে এসেছি। তুই এই রাত্রে গ্রামে ফিরছিস?'

'লাস্ট বাস মিস করলাম। আবার অন্ধকার সরে যাওয়ার আগে বেরুতে হবে। যাই।'

'এলি যখন তখন কিছুক্ষণ বসে যা।' যতীন বলল।

অতএব বসতে হল গগনকে।

গগন বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না যারা বামপন্থী রাজনীতি করেন তাদের কাছে জন্মভূমির মাটির কোনও দাম নেই। আমাদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জমি সরকার একটা সার্কুলার জারি করে কেড়ে নেবে আর আমরা সেটা মুখ বন্ধ করে দেখব তা হতে পারে না। আমি মনে করি এখনই জমি রক্ষা আন্দোলন শুরু করা দরকার। শুধু বিরোধী দল নয়, এই আন্দোলন হবে তাদের সবাইকে নিয়ে যারা মাটিকে মা বলে ভাবে। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল নয়, দলমতনির্বিশেষে আমরা একত্রিত হব জমির সম্মান বাঁচানোর তাগিদে। বন্ধুরা, আপনারা কী বলেন।'

ও পাশ থেকে যিনি কথা বললেন তাঁর গলার স্বর খুব চেনা চেনা বলে মনে হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার। আমাদের এলাকায় শিল্প আমরা চাইছি কিনা তার ওপর আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

যতীন বলল, 'দেখুন শিল্প চাই না বলাটা ঠিক হবে না। কিন্তু কীসের বিনিময়ে শিল্প চাইছি? নিজের জমির বিনিময়ে? তা হলে প্রস্তাব রাখা উচিত, এই পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার একর খাস জমি পড়ে আছে যেখানে কোনও ফসল হয় না। সরকার সেই সব জমিতে শিল্প করার কথা ভাবছেন না কেন? আমরা শিল্পের জন্যে চাষের জমি হাতছাড়া করতে চাই না।'

তৃতীয় একজন বললেন, 'সরকার যদি অধিগ্রহণের বদলে ঠিকঠাক দাম দিয়ে জমি নিতে চান তা হলে আমাদের ভূমিকা কী হবে? একফসলি জমি থেকে কী আয় হয় তা সবাই জানি। সরকার যদি ঠিকঠাক দাম দেন তা হলে সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে যে সুদ পাওয়া যাবে তার পরিমাণ জমির আয়ের থেকে অনেক বেশি হবে। তখন ক'জন মানুষকে আমরা আটকাতে পারব? এটাও ভাবা দরকার।'

চতুর্থ জন বললেন, 'এই ব্যাপারটটা খুব গুরুতর। মাড়োয়ারিদের কাছে আগে গোপনে যে সব জমি বিক্রি করা হয়েছে, সেগুলো থেকে নেওয়া যাচ্ছে না। একজন যেমন পূর্বপুরুষের সূত্রে পাওয়া জমির মালিক, তেমনি কয়েক পুরুষ ধরে সেই জমিতে যে চাষ করে আসছে তারও সমান মালিকানা আছে বলে এই সরকার স্বীকার করেছে। দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে লাঙল যার জমি তার নীতি সত্যি। তা-হলে জমি বিক্রি করার টাকার অর্ধেকটা যে চাষ করছে সে পাবে না কেন? মাড়োয়ারিরা যে পদ্ধতিতে জমি কিনেছে তা অবৈধ।

আমারবই.কম

সরকারকেও জমি কেনার সময় দু'পক্ষের কথা খেয়ালে রাখতে হবে। আর এই কারণেই আন্দোলন করা দরকার।'

যতীন চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'আপনাদের প্রত্যেকের কথায় যুক্তি আছে। এগুলো মাথায় রেখেই আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি এই আন্দোলন জমিরক্ষা সমিতির নামে করা হোক। সরকার পক্ষীয় পার্টির সমর্থকদের কেউ যদি মনে করেন বিবেকের তাড়নায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান তা হলে তাঁকেও আমরা গ্রহণ করব। আমি খবর পেয়েছি এই এলাকার পার্টির অন্যতম স্তম্ভ স্বপনদা অধিগ্রহণ প্রস্তাবের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। আমি আশা করছি এইরকম অনেকেই পার্টি থেকে বেরিয়ে আসবেন। আমাদের দরজা সবার জন্যে খোলা থাকবে। আপনারা কি আমার সঙ্গে একমত?'

দেখা গেল কেউ অন্যমতের কথা জানালেন না। যতীন বলল, 'জমিরক্ষা কমিটির কার্যক্রম ঠিক করতে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে একটা কমিটি তৈরি করা উচিত।'

একজন বললেন, 'হ্যাঁ। এখন আমাদের ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত।'

গগন উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি যতীন।'

যতীন মুখ তুলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে আছ?'

গগন একটু ভাবল, 'সময় এলে বলব।'

'আশা করি আমাদের আলোচনার কথা তোমার কাছ থেকে কেউ জানবে না।'

'তোমরা তো অন্যায় কিছু বলোনি। আমাকে বিশ্বাস করে এখানে ডেকেছ যখন তখন আমি তার অমর্যাদা করব না।' গগন রাস্তায় উঠে এল।

যতীনের সঙ্গে বাল্যকাল থেকে তার তুই তোকারি সম্পর্ক। আজকে শুরুর সময়েও ওরা পরস্পরকে তুই বলেছিল। কিন্তু সে আমি চলি বলতেই যতীন তুই থেকে তুমিতে উঠে গেল। আর আশ্চর্য! তার মুখ থেকেও আর তুই বের হল না।

গ্রামে ঢোকার মুখে ভিডিও হল আজ বন্ধ। গ্রামে ইতিমধ্যে ঘুম নেমে এসেছে। চারধারে কোনও শব্দ নেই। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল গগনের। কেবলই

মনে হচ্ছিল একটা ঝড় উঠবে। যতীনের সঙ্গে যাঁরা কথা বলছিলেন তাঁদের মুখ অন্ধকারে সে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছিল ওঁরা কেউ ওর দলের সমর্থক নয়। একটি বামপন্থী দল যারা সরকারে নেই, তাদের যা কিছু শক্তি তা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, কয়েক বছর হল এই এলাকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে খুব খারাপ ফল করলেও তাঁদের একজন ওই মিটিঙে ছিল বলে গগনের ধারণা। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর হল প্রথম যিনি বললেন তাঁকে নিয়ে। তাঁর কণ্ঠস্বর খুব চেনা মনে হচ্ছিল। গ্রামে ঢোকার পর দাঁড়িয়ে গেল গগন। না। কী করে সম্ভব? বাসস্ট্যান্ডে রবিদার যে গলা সে শুনেছে তার সঙ্গে এই মানুষটার গলা মিলে গেলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। আজীবন পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী রবিদা নিশ্চয়ই জমিরক্ষা কমিটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে পার্টির বিরুদ্ধে যাবেন না।

গগনকে বাড়িতে ফিরতে দেখে মা অবাক। রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গগন সংক্ষেপে সব বলতে মায়ের মুখে হাসি ফুটল, 'তা হলে কাল এখানে থেকেই যা।'

'টিভিটা খোলো তো।'

'আজকাল ঠিকমতো ছবি আসে না, খুব কাঁপে।'

'কাঁপুক। খোলো, খবরটা শুনি।'

ঘরে গিয়ে মা টিভির সুইচ অন করল। কয়েক বছর আগে এই সেকেন্ড হ্যান্ড সাদা-কালো টিভি প্রায় জলের দামে কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল গগন। ভাই এর সাদাকালো পছন্দ নয়, মা-ই দেখত। সেটা যে ঠিকঠাক কাজ করছে না, সারাতে হবে, তা আর মা তাকে জানায়নি। হয়তো নতুন খরচ বাড়াতে চায়নি।

টিভি-র ছবি কাঁপছে। কেবল নেওয়া হয়নি। কলকাতা ধরা যায় সহজে। কিছুক্ষণ ওলটপালট ছবি দেখার পর যখন শেষ খবর আরম্ভ হল তখন কোনওমতে বোঝা গেল আগামীকাল বিরোধী নেত্রী মহামিছিল বের করছেন। বন্ধের ডাক দেওয়া হয়নি। শোনার পর গগন বলল, 'যাহোক কিছু বেড়ে দাও, ভোর চারটের সময় বের হতে হবে।'

আমড়া বাদে ভাতে ভাত আর ডাল খেয়ে নিচ্ছিল গগন। মা জিজ্ঞাসা করল,

আমারবই.কম

'আচ্ছা, এখানে তো এখনও সমস্যা শুরু হয়নি, তা হলে কলকাতায় মিছিল হবে কেন?'

'পশ্চিমবাংলার যে কোনও জায়গায় গোলমাল হলে কলকাতায় নেতারা তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেখান। আমার ভয় হচ্ছে এখানে শান্তি থাকবে কিনা!'

'তুই আবার কবে আসবি?'

'সুযোগ পেলেই চলে আসব। তুমি চিন্তা করো না।'

এই সময় খিড়কি দরজায় শব্দ হল। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই বাইরে ছিল?'

'না তো। ও তো খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।' মা উঠে দাঁড়াল।

'কেউ যেন ভেতরে এল!' গগন বলল।

মা বাইরে পা বাড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি, ঝরনা।'

'একী! তুই? এত রাত্রে, ভেতরে আয়।'

মায়ের সঙ্গে ঝরনা ঘরে এল। বিমর্ষ মুখ। গগন অবাক হয়ে দেখল। মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

ঝরনা বলল, 'একা বাড়িতে থাকতে আমার ভয় লাগছে।'

'কেন? ঠাকুরপো নেই?'

'না। বাবা বিকেলবেলায় বিজুরিতে গিয়েছে মিটিং করতে, বলেছিল ন'টার মধ্যে ফিরে আসবে। এখনও ফেরেনি। আমার খুব ভয় করছে।' ঝরনা বলল।

'নিশ্চয়ই মিটিং শেষ হয়নি বলে দেরি হচ্ছে। খেয়েছিস?'

'না।' নিচু গলায় বলল ঝরনা।

'কেন?'

'বাবাকে খাবার দিয়ে আমি খাই।'

'একটু ভাত ডাল আর আলু-পটল সেদ্ধ আছে, খাবি?'

'না।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগছে না জেঠিমা। খুব ভয় করছে।'

'ভয় কেন?'

'আমি বলতে পারব না।' ঝরনা মাথা নাড়ল।

এতক্ষণে খাওয়া শেষ করল গগন। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সারা রাত

না খেয়ে থাকর কোনও মানে হয় না। হয়তো বিজুরিতেই যদুকাকা খেয়ে নিয়েছেন। তুমি ওকে খেতে দিয়ে দাও।' গগন হাতমুখ ধুতে গেল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় সামান্য খেল ঝরনা।

গগনের মনে হচ্ছিল ঝরনা কোনও কথা গোপন করল। কিন্তু জোর করে ওর মুখ খোলাবার কী দরকার। বিজুরিতে নিশ্চয়ই পার্টির গোপন মিটিং হচ্ছে। এই মহকুমার সাংসদের ডান হাত গোরা দত্ত বিজুরির লোক। পার্টি থেকে পাওয়া ক্ষমতা সাংসদ গোরা দত্তের মাধ্যমে প্রয়োগ করেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে স্বপনদার সঙ্গে গোরা দত্তের যে মতবিরোধ ছিল তা পার্টির স্বার্থে কখনও বাইরে আসেনি। স্বপনদার পদত্যাগের ফলে বিজুরির গোরা দত্তের ভূমিকা আরও জোরদার হবেই। মা এসে বলল, 'শুয়ে পড়। চারটে বাজতে বেশি দেরি নেই। আমি জেগে আছি, তোকে ঠিক সময়ে ডেকে দেব।'

দিনের প্রথম বাস ঝড়ের মতো ছুটে এসেছিল কলকাতায়। হাতে সময় পেয়ে যাওয়ায় বাগবাজার হয়ে ডিউটিতে যোগ দিতে পেরেছিল সময় মতো। গাড়ি বের করে ধোলাইওয়ালাকে ধোওয়ার জন্যে দিয়ে সে বাড়ির সামনে আসতেই পাশের বাড়ির সাংবাদিক ভদ্রলোক তাকে ডাকলেন। গগন এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার।'

'খবর কী বলো?'

'খবর ভাল নয়।'

'তুমি সেবার গ্রাম থেকে আসার পর আর যাওনি?'

'এই মাত্র ফিরেছি গ্রাম থেকে।'

'কী দেখলে?'

'দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদল জমি রক্ষা করতে চায়, অন্য দল, যারা পার্টি করে, তারা শিল্প চাইছে।' গগন বলল।

'দু' দলের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা আছে?'

'সেরকম কিছু কখনও গ্রামে হয়নি। সবাই তো সবাইকে চেনে।'

'তুমি কাদের সাপোর্ট করছ?'

'শিল্প হলে মানুষের উপকার হবে বলে সেটা চাইছি। আবার সরকার যদি জোর করে জমি দখল করে নিতে চায় তা হলে তা মেনে নিতে পারছি না।' গগন বলল।

আমারবই.কম

‘সরকার যদি জমি অধিগ্রহণ করে তা হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েই করবে।’

‘ও। ওখানে সবাই ভাবছে অধিগ্রহণ মানে জোর করে দখল করা।’

‘না। ওটা ভুল বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা ওখানে কী কী কারখানা হবে তা জানো?’

‘মোটরগাড়ির কারখানা হবে বলে শুনেছি।’

‘হ্যাঁ। সস্তার মোটরগাড়ি তৈরি হবে। এখন সাড়ে তিন লাখ টাকার নীচে মোটরগাড়ি পাওয়া যায় না, কারখানা থেকে যেগুলো বেরুবে তার দাম এক লাখ টাকার একটু বেশি হবে।’

‘লাখ টাকার গাড়ি? ধ্যেৎ! তা কি হয়?’

‘হবে, তবে তুমি যে গাড়ি চালাও তার মতো শক্তিশালী অথবা আরামদায়ক হবে না।’ সাংবাদিক বললেন, ‘আচ্ছা, তোমার গ্রামে ওই লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কেনার সামর্থ্য কত জন মানুষের আছে। এই শিল্প কত জনকে উপকৃত করবে?’

‘এক বা দু’জন।’

‘কিন্তু এই কলকাতায় হাজার হাজার লোক অপেক্ষা করবে ওই গাড়ি কিনতে। আমাদের পাড়ায় পানওয়ালা ঠাকুর বলেছে ধার করে হলেও গাড়ি কিনবে।’ সাংবাদিক হাসলেন, ‘তা হলে শিল্প স্থাপিত হবে গ্রামে আর তার জন্যে উপকৃত হবে শহরের মানুষ। আমি তো অন্য একটা কারণে শিউরে উঠছি। ওই সস্তার গাড়ি এবং তার সঙ্গে মোটরবাইক বাজারে এলে কলকাতার রাস্তা স্তব্ধ হয়ে যাবে। এখনই মোটরবাইক আর অটোর জ্বালায় প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়। তখন গাড়ি মুভ করবে না। নতুন রাস্তা তৈরি না করে ওই সব গাড়ি বিক্রি করা মানে চব্বিশ ঘণ্টার ট্রাফিক জ্যাম ডেকে আনা।’ সাংবাদিক বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

গগনের মনে হল ভদ্রলোক মিথ্যে বলেনি। প্রথম কথা গ্রামের গরিব মানুষ ওই গাড়ি কিনতে পারবে না। যে পারবে সে কিনে করবে কী? ওই কারখানাগুলোতে তারাই কাজ পাবে যাদের গাড়ি তৈরির বিদ্যে আছে। তাদের গ্রামে তেমন কোনও ছেলে নেই। অর্থাৎ গ্রামের কেউ ওখানে চাকরি পাবে না। কথাটা ঠিক, গ্রামে শিল্প হলে উপকৃত হবে শহরের মানুষ। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল গগনের।

আজ গাড়ি চালাতে গিয়ে দু’বার বোকার মতো ভুল করে ফেলল গগন। একবার গিয়ার না পালটে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন শুনল, দ্বিতীয়বার লাল আলো হয়ে যাচ্ছে দেখতে না পেয়ে মোড় পেরিয়ে এল।

পেছনের সিটে বসে মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কী হয়েছে গগন?’

‘আজ্ঞে, কিছু না।’

‘গাড়িটা বাঁদিকে দাঁড় করাও।’

আদেশ মান্য করল সে। মালিক বললেন, ‘এত দিন গাড়ি চালাচ্ছ কিন্তু কখনও এই ভুলগুলো করোনি। তুমি কি কাল রাত্রে ঘুমাওনি?’

একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল গগন, ‘আজ্ঞে, না।’

‘কেন?’

‘জমি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে—।’

‘সেটা জানি। তুমি বরং একটা কাজ করো। কিছু দিন ছুটি নাও। আমি কন্ট্রাক্ট ড্রাইভার আনিয়ে নেব। দিন সাতেক গ্রামে কাটিয়ে এসো। মনে অশান্তি নিয়ে গাড়ি চালানো যায় না। চলো।’ মালিক স্পষ্ট কথা বললেন। কৃতজ্ঞ বোধ করল গগন। বলল, ‘আপনি যখন ছুটি দিচ্ছেন তখন এই সাত দিনের মাইনে আমাকে দেবেন না।’

মালিক কোনও কথা বললেন না।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মেট্রো সিনেমার সামনে বিরোধী নেত্রী এবং অন্যান্য নেতারা যে মিছিল নিয়ে এলেন তার আয়তন খুব বেশি ছিল না। কিন্তু টিভি-র দৌলতে গোটা দেশের মানুষ জেনে গেল শিল্পের নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের জমি জবরদখল করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হল কোনও জমি অধিগ্রহণ করার সময় শক্তি প্রয়োগ করা হবে না। সরকারি অফিসারদের ওই সব গ্রামে পাঠানো হবে কোন কোন জমি নিস্ফলা অথবা এক ফসলি তা সার্ভে করতে। সেই সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গেলে শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলে জমি নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জনসাধারণের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

খবরটা গত রাত্রে রমাপ্রসাদদার টিভিতে দেখে খুশি হয়েছিল গগন। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কথা বলেছেন। এরপর কারও মনে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

আমারবই.কম

গ্রামগুলোতে শান্তি ফিরে আসবেই। সাত দিনের হঠাৎ পাওয়া ছুটিতে সে সকাল সকাল রওনা হল শিবচরণপুরের উদ্দেশে।

কিন্তু ভক্তহাটের আধ মাইল আগে গাড়িগুলো যখন ডান দিকে ঘুরে যেতে লাগল এবং কন্ডাক্টার ঘোষণা করল ভক্তহাটে বাস যাবে না তখন সিঁদুরে মেঘ দেখল গগন। ভক্তহাটকে বাইপাস করে গাড়িগুলো এগিয়ে গেল। যে রাস্তায় ভ্যানরিকশা ছাড়া কিছু যেত না সেখানে এখন ভারী বাস যাচ্ছে।

নীচে নেমে একটা ভ্যানরিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি ঘুরে যাচ্ছে কেন?'

'ওদিকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সব বন্ধ।'

'বন্ধ কেন?'

'তা জানি না। আপনি যদি যেতে চান ভ্যানে উঠে বসুন। ভক্তহাট, পাঁচ টাকা।' লোকটা চেঁচাতে লাগল, 'ভক্তহাট পাঁচ টাকা, জলদি চলে আসুন।'

সোজা ভক্তহাটে না গিয়ে শর্টকাট পথ ধরে বেঙ্কেমারি হয়ে শিবচরণপুরে যাওয়া যায়। গগন সেই পথ ধরল। বাঁশবাদাড় ভেঙে আলপথ দিয়ে বেঙ্কেমারিতে পৌঁছে স্লোগান শুনতে পেল সে। 'প্রাণ দেব জমি দেব না।' তারপর একটা ছোট মিছিল দেখতে পেল। বিরোধী দলের পতাকা নিয়ে তারা চিৎকার করতে করতে হাঁটছে। বেঙ্কেমারির বেশির ভাগ দোকান বন্ধ। রাস্তায় মানুষের ভিড়। সবাই সরকারবিরোধী কথা বলছে। গগনের মনে হল ওদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সরকার গায়ের জোরে কারও জমি দখল করবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথার ওপর সবার আস্থা রাখা উচিত। কিন্তু চার পাশে তাকিয়ে গগন বুঝতে পারল এ সব কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ওরা তাকে পছন্দ তো করবেই না, উলটে মারধরও করতে পারে।

গ্রামে ঢুকে গগন অবাক হয়ে গেল। একমাত্র রতনের এস টি ডি বুথ ছাড়া সব বন্ধ হয়ে আছে। তাকে দেখে রতন বলল, 'তুমি কি কলকাতা থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ।' গগন কাছে গেল।

'কী করে এলে। বাস তো শুনলাম বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ভক্তহাটের আগে ঘুরে গেল। হেঁটে আসছি। কিন্তু বন্‌ধ ডাকল কে?'

'জমি রক্ষা কমিটি।' রতন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমারটা বাদ দিয়েছে জরুরি পরিষেবা বলে।'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল। কারা কারা আছে কমিটিতে?'

'সব দলের নেতারা আছে শুধু সরকারি পার্টির কেউ নেই। কিন্তু সরকারি পার্টির অনেকে নাকি এদের সাপোর্ট করছে।' রতন বলল।

'কিন্তু বন্‌ধ ডাকল কেন?'

'তা জানি না। কলকাতায় খবর যায়নি?'

'না।' গগন বাড়ির পথ ধরল।

তাকে দেখে মা অবাক, 'একী! চলে এলি যে! শরীর খারাপ নাকি?'

'না। ভাল লাগছিল না। মালিক সাত দিন ছুটি দিয়ে দিলেন। আমাকে একটু মুড়ি দাও। সেই কাকভোরে বেরিয়ে এসেছি।'

হাতমুখ ধোয়ার পর তেলমাখা মুড়ি, লঙ্কা দিয়ে খেতে খেতে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই কোথায়?'

মা বলল, 'আর বলিস না। কাল থেকে যতীনদের সঙ্গে মিছিলে ঘুরছে। কথা বলতে পারে না কিন্তু অন্যেরা যখন চেঁচাচ্ছে তখন সে শূন্যে হাত ছুড়ছে। রাত্রে খুব বকেছি। তোর কানে গেলে রাগ করবি শোনার পরেও ভোর হতে না হতেই ছটফট করেছে। তখন আর বাধা দিইনি। সারা দিন বাড়িতে বসে থাকে আর ইদানীং নাইট শোতে ভিডিও সিনেমা দেখে। কারও সঙ্গে মেশে না. বন্ধুবান্ধবও তেমন নেই। যদি এই করে একটু খুশি থাকে, তাই থাকুক। তুই ওর ওপর রাগারাগি করিস না।'

'কিন্তু মা এটা খেলা নয়। যতীনরা যদি সামলাতে না পারে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তখন ভাই-এর মতো বোকারাই পড়বে বিপদে।' গগন গম্ভীর গলায় বলল।

'ও সব কিছুই হবে না। অন্যায় তো কিছু করছে না। নিজের জমি যদি কেউ দিতে না চায় তা হলে জোর করে নেবে এ কেমন কথা?'

'জোর করে জমি নেওয়া হচ্ছে না।'

'গায়ের জোর আর টাকার জোর একই কথা।' মা বলল।

গগন অবাক হয়ে গেল। সে চাইল মাকে ভাল করে বোঝাতে। কিন্তু তার আগেই খিড়কি দরজায় শব্দ হল। মা গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, ' কে?'

'কাকিমা, আমরা!' একটি মেয়ের গলা ভেসে এল।

আমারবই.কম

'চলে আয়। ঠেললেই খুলে যাবে।'

দরজা ঠেলে উঠোনে চলে এল পাঁচটা অল্পবয়সি মেয়ে। প্রত্যেকের মুখ চেনে গগন।

'কী খবর বল?' মা জিজ্ঞাসা করল।

'আজ বেলা আড়াইটের সময় কালীমন্দিরের সামনে সবাইকে আসতে বলা হয়েছে।'

'আজকে শুধু আমাদের গ্রামের মেয়েরা আসবে?'

'এখানে যেমন আমাদের গ্রামের মেয়েরা যাবে তেমনি বেন্ধেমারি, রানিচকে ওই একই সময়ে ওখানকার মেয়েরা জড়ো হবে।' পাঁচজনের একজনই কথা বলছিল। গগন দেখল মেয়েটা বেশ চটপটে, কুড়ি-একুশ বয়স।

'বেশ যাব। সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলিস কিন্তু, কেউ যেন বাদ না পড়ে।' মা বলল, 'কারা কাকে ভোট দেয় তা নিয়ে ভাববি না।'

'না না। সবাইকে বলছি, বলব। আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে বলছি।'

দ্বিতীয় মেয়েটি নিচু গলায় প্রথমজনকে কিছু বলতে প্রথমজন বলল, 'ছাড় তো।'

মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে রে?'

'আর বোলো না কাকিমা। ঝরনাকে বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু ওর বাবা এত খারাপ ব্যবহার করল যে কী বলব?'

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মেয়েটির গলা খুলল, 'ভীষণ বদমাস বুড়ো। বলে কিনা তোরা নিজেরা নষ্ট হয়েছিস তাতে মন ভরছে না? এখন আমার মেয়েটাকে নষ্ট করতে এসেছিস? পুলিশ যখন থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে চাবকাবে তখন কোন বাবা তোদের বাঁচাতে যাবে? কী অসভ্য লোক! ওঁকে আমরা পঞ্চায়েতে ভোট দিয়েছিলাম, আর দেব না।'

গগন দেখল মায়ের মুখ শক্ত হয়ে গেল, 'ঝরনা ছিল ওখানে?'

'না। আমাদের তো ভেতরে ঢুকতেই দেয়নি।' প্রথম মেয়েটি বলল।

'ঠিক আছে। তোরা যা।' মা দ্বিতীয় মেয়েটির দিকে তাকাল, 'তুই তো এখান দিয়েই যাবি। যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে নিবি? অনেক দিন আমি একা পথে বেরুইনি। একা হাঁটতে কেমন অস্বস্তি হয়।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে সওয়া দুটোর সময় ডাকব। আসি।'

ওরা চলে গেল। মুড়ির খালি বাটি তুলে মা জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবি?'

তখনও মায়ের দিকে তাকিয়েছিল গগন, জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'শুনলি তো। কালীবাড়ির সামনে মেয়েরা যাচ্ছে।'

'কেন?'

'কেন মানে? সব জেনেও তুই জিজ্ঞাসা করছিস?'

'কিন্তু, তোমরা কী করবে? এ সব রাজনৈতিক দলের কাজ।'

'রাজনৈতিক দলগুলোর ঠিকানা আকাশে নাকি? আমরা ভোট দিই বলেই তো ওরা বেঁচে থাকে। এটা আমাদের সমস্যা। জমি চলে গেলে দু'বেলা যে ভাতটুকু রেঁধে দিতে পারছি তাও তো পারব না। সংসারে যখন সমস্যা আসে তখন সেটা শুধু ছেলেরা সামলাবে, মেয়েদের গায়ে আঁচ পড়বে না এমন কথা যদি দিতে পারিস তা হলে সবাইকে নিষেধ করে দেব মাথা না ঘামাতে। নাকি ওই যদুঠাকুরপোর মতো তোরও মনে হচ্ছে যে মেয়েরা বাইরের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালে নষ্ট হয়ে যাবে।' মা কেটে কেটে কথাগুলো বলল।

মাথা নাড়ল গগন, 'আমি এ সব ভেবে কথা বলিনি। এই গ্রামের দুই তিনটে পার্টিকরা মেয়ে ছাড়া কাউকে তো কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে রাস্তায় বেরুতে দেখিনি। অভ্যস্ত নই বলে ব্যাপারটা অন্যরকম ঠেকছিল।'

'আমি তো রাজনৈতিক ব্যাপারে ওখানে যাচ্ছি না। আমার হেঁসেলে যাতে টান না পড়ে সেই কারণে যাচ্ছি। আর বকতে পারব না, অনেক কাজ পড়ে আছে।' মা চলে গেল।

গগন খানিকক্ষণ বসে রইল। মাকে এই ভঙ্গিতে কথা বলতে সে কখনও দ্যাখেনি। বোঝাই যাচ্ছে, নতুন কিছু করার সুযোগ পেয়ে মা বেশ চনমনে হয়ে আছে।

সে উঠল। তারপর গলা তুলে বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে মায়ের গলা ভেসে এলো, 'চা খাবি না?'

'না।'

'বেশি দেরি করিস না। দু'টোর মধ্যে রান্নাঘরের পাট শেষ করব।' মা জানিয়ে দিল।

আমারবই.কম

গ্রামের রাস্তায় মাঝে মাঝে মানুষের জটলা। গগনকে দেখে পরিচিত মুখগুলোয় হাসি ফুটছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কলকাতা থেকে এলে?'

গগন দাঁড়াল। যার সঙ্গে কথা বলছে সে, তার নাম গোবর্ধন। শিবচরণপুরের ওপাশে বাদা অঞ্চল। তারপর আলতা নদী। সেই নদী চলে গেছে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে মৃদঙ্গডাঙায়। সেখান থেকে সমুদ্রে। ওই আলতা নদীতে মাছ ধরার ব্যবসা গোবর্ধনের। স্কুলের নিচু ক্লাসে কয়েক বছর হামাগুড়ি দিয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। গোবর্ধনের মুখের ডান দিকটার অনেকখানি অপারেশনের দাগ, যা আমৃত্যু ওর সঙ্গী হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগে আলতা নদী থেকে মাছ ধরে ফেরার সময় বাঘের থাবা খেয়েছিল ও। মাছের ব্যবসায় পয়সা কামিয়েছে বলে চটজলদি কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে বেঁচে গিয়েছিল কোনও রকমে।

গগন জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'এখানকার কথা ওখানে আলোচনা হচ্ছে? শুনলে কিছু?'

'হ্যাঁ। একটু আধটু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কারও জমি জোর করে দখল করা হবে না।'

'সে তো আমরা টিভিতে শুনেছি। ওসব কথার কথা।' গোবর্ধন বললে বাকিরা মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল। এই বাকিদেরও গগন চেনে। এদের কাউকে রাজনীতি করতে সে দ্যাখেনি।

গগন বলল, 'এত তাড়াতাড়ি অবিশ্বাস করছ কেন?'

'মুখ্যমন্ত্রী এক কথা বলছেন আর তাঁর দলের এম পি অন্য কথা বলছেন। মানুষ প্রতিবাদ জানাতে বারো ঘণ্টার বন্‌ধ করছে। এম পি-র লোকজন সেই বন্‌ধ ভাঙার জন্যে মিছিল করবে কেন? একটু আগে শুনলাম বিজুরির গোরা দত্তের লোকজন সেখানকার বিরোধী দলের অফিস ভাঙচুর করেছে, মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ওই দলের সমর্থকদের। গোরা দত্ত তো এম পি-র ডান হাত। তার কথাই বিজুরিতে শেষ কথা। তা হলে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাস করব কী করে?' গোবর্ধন বেশ উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলল।

গগন বলল, 'তুমি কথাগুলো শুনেছ, নিজের চোখে দ্যাখোনি। মুখে মুখে কথা অনেক বদলে যায় তাই না?'

গোবর্ধন চোখ ছোট করল, 'ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি ওই পার্টির লোক।'

গগন হেসে ফেলল, 'আমি কোনও সক্রিয় রাজনীতি করি না। করি না বলেই এবার পঞ্চায়েতে দাঁড়াইনি। সরকার তিরিশ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে, এটা তো এমনি এমনি হয় না। প্রত্যেকবার মানুষই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। এত দিন যে সরকার জনগণের সরকার ছিল, সর্বহারার পাশে দাঁড়াত, ভাগচাষিদের মর্যাদা দিয়েছে, সে রাতারাতি জনগণের শত্রু হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি দেখি এই সরকার জোর করে জমি দখল করতে চাইছে, তা হলে আমিও প্রতিবাদ করব।'

'কী করবে? কীভাবে?'

'সামনের বার ওদের ভোট দেব না।'

গোবর্ধন হো হো করে হেসে উঠল, 'জমি ওদের হাতে তুলে দিয়ে ভোট না দিলে তোমার কী লাভ হবে?'

এই সময় একটা সাইকেলকে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে দেখল ওরা। বোঝা যাচ্ছিল যে সাইকেল চালাচ্ছে সে খুব উত্তেজিত। ওদের সামনে এসে ছেলেটা ব্রেক কষে দাঁড়াল, 'তোমরা যতীনদাকে দেখেছ? এ দিকে কি এসেছে?'

গোবর্ধন মাথা নাড়ল, 'একটু আগে মিছিল নিয়ে পশ্চিমপাড়ায় গিয়েছে।'

ছেলেটা আবার সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাতে যাচ্ছিল, গোবর্ধন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'খুব মারপিট হয়েছে। বিজুরি আর ভক্তহাটের পার্টির লোকজনদের নিয়ে গোরা দত্ত ভক্তহাটের দোকান খুলিয়েছে? যে খুলতে চায়নি তাকে মেরেছে। ওরা ওখানে বন্‌ধ করতে দিচ্ছে না। চলি।' ছেলেটা যতীনের খোঁজে চলে গেল।

গোবর্ধনের এক সঙ্গী বলল, 'খুব অন্যায় কথা। ওরা বন্‌ধ ডাকলে হয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর বিরোধীরা বন্‌ধ ডাকলে ওরা গায়ের জোরে ভাঙবে?'

গোবর্ধন গগনকে বলল, 'তোমার জমি তো এক ফসলি?'

'হ্যাঁ।'

'যদি নাও হত তুমি এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে?'

'না। খুব অন্যায় হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি দলের লোকেরা যে এই সব করছে তা মুখ্যমন্ত্রী জানেন না।' গগন বলল।

আমারবই.কম

'জানেন না বললে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে? পার্টির সেক্রেটারি জানেন না? তিনি জানলে মুখ্যমন্ত্রীও জানবেন?' জটলার একজন বলল।

গোবর্ধন বলল, 'তুমি বলবে এত ছোট ছোট ব্যাপার কেউ মুখ্যমন্ত্রীর কানে তোলে না। তোমাকে একটা কথা বলি। আমরা যখন মাছ ধরতে যাই তখন দলে থাকি আটজন। ওই বাদা অঞ্চল পার হতেই পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়। তারপর আলতা নদী। যে ঘাট থেকে নদীতে উঠি সেখানে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। গ্রামের লোকগুলোর বেশির ভাগই ভক্তহাটে আসেনি, কলকাতা দূরের কথা। ওখানে কেউ যদি কাউকে মেরে ফেলে তা হলে ভক্তহাটের বিডিও সাহেবের কাছে খবর পৌঁছাবে না। মাসে দু-বার ফরেস্ট ডিপার্টের লোকজন যায়। আর যায় পাইকারের লোক। ওদের কাছ থেকে মধু আর চিংড়িমাছ কিনে নিয়ে আসে জলের দরে। সেই টাকা নিয়ে বাদার পাশের গঞ্জে গিয়ে চাল চিনি তেল কেনে ওরা। আমরা যখন ওখানে গিয়ে থাকি তখন ওদের জন্যে আলু পেঁয়াজ চিনি নিয়ে যাই। এই শিবচরণপুরের কোনও মানুষ জানতেই পারে না আমরা ওখানে কী করছি। সেই সুযোগ নিয়ে আমরা যদি কোনও অন্যায় ওখানে করি তা হলে পরের বার ওরা আমাদের সহ্য করবে কী? আমার কাছে ওই বাদা অঞ্চলের গ্রাম আর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ভক্তহাট একই।'

গগন চুপচাপ শুনছিল। গোবর্ধন হাসল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না। তা হলে চলো আমার সঙ্গে। গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসবে।'

গোবর্ধনদের কাছ থেকে বেরিয়ে এল গগন। গ্রাম থেকে বেরিয়ে মজাখালের ওপর নতুন ব্রিজের পাশে হরনাথদার চায়ের দোকানে এসে অবাক হল সে। দোকানে কোনও লোক নেই। হরনাথদা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। রাস্তায় দু' পাশে মাঠ, কোনও মানুষ ধারে কাছে নেই। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার হরনাথদা?'

হরনাথ তাকাল, 'ও, তুমি! দ্যাখো, কীরকম শ্মশানে বসে আছি?'

'কেউ আসেনি? চা বিক্রি করছেন না?'

'বত্রিশ কাপ চা বানিয়েছি, একটা পয়সাও পাইনি।' হরনাথদা হাসলেন। বিষণ্ণ হাসি।

'কেন?'

'গোরা দত্তের ছেলেরা এসে বলল চা দাও। দোকান বন্ধ রাখা চলবে না।

চা করে দিলাম। বলল, দাদার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো। মোট সাতটা দলে এসেছিল।'

'তা হলে মন খারাপ করার কী আছে? গোরা দত্তের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো।'

'ভাই গগন, আমার ঘাড়ে একটাই মাথা আছে, সেটা খোয়াতে পারব না। আমি টাকা চাইলে গোরা এই দোকান তুলে দেবে। অবশ্য রেখেই বা কী লাভ। অরাজকতা তো আরম্ভ হয়ে গেল। হাঁটুর বয়সি ছেলেগুলো, যারা কখনও দোকানে ঢুকতে সাহস পেত না, এসে চায়ের অর্ডার দিয়ে বলে সিগারেট দাও। নেই শুনে কী রাগ! এরাই তো এখন থেকে আমার খদ্দের হবে।'

অন্যমনস্ক হল গগন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন গায়ের জোরে কারও জমি দখল করা হবে না। গায়ের জোরে বিনা পয়সায় চা খেয়ে যায় যারা, তারা কি মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনবে? কী রকম অস্বস্তি শুরু হল গগনের মনে।

এক কাপ চা বানিয়ে গগনের পাশের বেঞ্চিতে রাখল হরনাথদা, 'খেয়ে নাও।'

কাপ তুলে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'বিকাশরা আসেনি?'

'সকালের দিকে দেখেছিলাম দলের ছেলেদের নিয়ে সাইকেলে ভক্তহাটের দিকে যেতে। এখনও ফেরেনি। আমার ওপর গোরার ছেলেরা হুকুম দিয়ে গেছে সন্ধে পর্যন্ত দোকান খুলে রাখতে হবে। দুপুরে ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়িতে খেতে গেলেও নাকি বন্‌ধ করেছি বলে মনে করা হবে। আচ্ছা, হঠাৎ এই জুলুমবাজি শুরু হল কেন বলো তো?'

'এত দিন এই তল্লাটে কোনও বিরোধী পক্ষ ছিল না বলে ওরা একটু উদার ছিল।'

'রাতারাতি বিরোধী পক্ষ গজিয়ে গেল? এমন হয় নাকি?'

'আগে ভাবতাম হয় না, এখন বুঝছি হয়।'

'কী করে?'

'বিরোধীরা বন্‌ধ ডাকল আর সঙ্গে সঙ্গে শিবচরণপুর, বেঙ্কেমারি, ভক্তহাটের মানুষ তাতে সাড়া দিল। এরকম কখনও হয়েছে? অথচ আজ হল। তাই সরকার পার্টিকে গায়ের জোরে বনধ ভাঙতে হচ্ছে। মাটির টান বড় টান হরনাথদা। তুমি অভাবে পড়ে তোমার জমি বিক্রি করো যখন তখন

আমারবই.কম

হাতে টাকা পেলেও বুকে রক্ত ঝরে। চুপচাপ সেই কষ্ট সহ্য করে যাও। কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ যদি জমি নিতে চায় তা হলে তুমি বাধা দেবেই। তোমার মতো অনেক মানুষ তখন এককাট্টা হয়ে যাবে। রাতারাতি।'

এই সময় একটা টাটা সুমো গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখল গগন। গাড়িটা এসে থামল দোকানের সামনে। গাড়ির সামনের কাচের ওপর প্রেস শব্দটি লেখা রয়েছে।

সামনের সিটে বসা একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিজুরি ওই ব্রিজের ওপাশে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল গগন।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বললেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিন জন। একজনের হাতে ভিডিও ক্যামেরা। প্রথম জন হরনাথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা হবে?'

হরনাথদা মাথা নাড়ল, 'হবে।'

'তিন কাপ চা দিন আর তিনটে বিস্কুট।'

ওরা বেঞ্চিতে বসল। প্রথমজন গগনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা কলকাতা থেকে এসেছি টি ভি-র জন্যে নিউজ করতে। চায়ের দোকান খোলা যখন তখন এখানে নিশ্চয়ই বন্‌ধ হচ্ছে না। ভক্তহাটে দেখলাম দোকান খুলে গেছে।'

হরনাথদা চায়ের জোগাড় করতে করতে বললেন, 'ভাই আপনারা চা খেতে নেমেছেন, চা খেয়ে চলে যান, আমাদের এ সব প্রশ্ন করবেন না।'

সাংবাদিকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন?'

গগন জবাব দিল, 'বিজুরিতে গিয়ে দেখবেন সব কিছু খোলা। বাজার স্কুল কিছুই বন্ধ নয়। আপনারা কথা ভাল ভাবে বলতে পারবেন।'

সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বিজুরিতে থাকেন?'

'না। শিবচরণপুরে।' গগন বলল।

'ও। আপনাদের ওখানে কী অবস্থা?'

'গিয়ে দেখুন।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনিও কথা বলতে চাইছেন না।'

গগন জবাব দিল না। হরনাথদা চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ছ'টাকা দেবেন চায়ের জন্যে, বিস্কুট দেড় টাকা।'

রিপোর্টার দাম মিটিয়ে দেওয়া মাত্র পাঁচটা সাইকেল পার্টির ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দোকানের সামনে চলে এল, 'পাঁচটা চা, ঝটপট।'

'দাম দেবে তো?' হরনাথদা জিজ্ঞাসা করল।

'দাদা দেবে। ওর কাছে গিয়ে চাইবেন।' একজন বলল।

'তা হলে চা দিতে পারব না।'

সাইকেল দাঁড় করিয়ে ছেলেটা হরনাথদার সামনে এগিয়ে এল, 'আপনি কি ভেবেচিন্তে কথাটা বললেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে দাদাকে আপনি অপমান করছেন?' চিৎকার করল ছেলেটা।

'আমি কাউকে অপমান করছি না। তোমাদের আগে বত্রিশ জন ওই দাদার নাম করে চা খেয়ে গিয়েছে। আমার পক্ষে আর বাকি দেওয়া সম্ভব নয়।'

'কে কী খেয়েছে জানি না, আপনি দাদার নাম বলা সত্ত্বেও চা দিতে রাজি হননি। এরপরে এখানে দোকান চালাতে পারবেন?'

'দেখি!'

'দেখবেন? এই মুহূর্তে আপনার দোকান ভেঙে দিতে পারি তা জানেন?'

এই সময় পেছনে দাঁড়ানো সঙ্গীদের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'এই, তোর ছবি তুলছে। টিভি-তে দেখাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল ক্যামেরাম্যানের দিকে। চায়ের কাপ রেখে বেঞ্চিতে বসে ভদ্রলোক ছবি তুলে যাচ্ছিলেন।

ছেলেটা চেঁচাল, 'এই, অ্যাই, বন্ধ করো, বন্ধ করো ক্যামেরা।'

সাংবাদিক বলল, 'আমরা প্রেসের লোক। আপনি বাধা দিতে পারেন না।'

'খালবাত দিতে পারি। এই সব ব্যক্তিগত কথাবার্তা পাবলিককে দেখানো চলবে না। ক্যাসেট বের করে দিন। ঝামেলা বাড়াবেন না।' ছেলেটা হুংকার দিল।

ক্যামেরাম্যান কোনও কথা না বলে তাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটা চেঁচাল, 'ধর শালাকে। ধর, পালিয়ে যাবে।'

সাইকেল মাটিতে রেখে বাকিরা দৌড়ে গিয়ে ক্যামেরাম্যানকে ধরল। ক্যামেরাম্যান প্রাণপণে ক্যামেরা বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। সাংবাদিক এবং তার সঙ্গীও ছুটল ক্যামেরাম্যানকে সাহায্য করতে। কিন্তু তার আগেই ছেলেগুলো

আমারবই.কম

ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। একজন ক্যামেরা খোলার চেষ্টা করছিল, বাকিরা এলোপাথাড়ি মারতে লাগল ক্যামেরাম্যানকে। তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সাংবাদিক ও তার সঙ্গীর ওপর। গগন এতক্ষণ চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে বাইরে বেরিয়ে এসে শান্ত গলায় বলল, 'ওদের ছেড়ে দিন ভাই।'

ছেলেগুলো তাকাল। একজন চাপা গলায় বলল, 'বিকাশদার বন্ধু। আমাদের পার্টির।'

মানুষ ছেড়ে ছেলেগুলো পাথর দিয়ে সুমো গাড়ির কাচ ভাঙল। তারপর সাইকেলে চড়ে চলে গেল বিজুরির দিকে। যাওয়ার সময় ক্যামেরা থেকে ক্যাসেট বের করে নিয়ে গেল।

গগন এবার ক্যামেরাম্যানকে নীচ থেকে তুলল। তার মুখ রক্তাক্ত, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল মানুষটা। হরনাথদাও সক্রিয় হয়ে সাংবাদিক এবং তাঁর সঙ্গীকে সাহায্য করছিলেন। এই সময় খেজুরির দিক থেকে চারটে মোটরবাইক এগিয়ে এসে থামল দোকানের সামনে। তিনটে মোটরবাইকে ছয়জন আরোহী নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চতুর্থ থেকে যিনি নেমে এলেন তাকে দেখে গগন অবাক। গোরা দত্ত দুই হাত জোড় করে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত। একটু আগে খবর পেলে আপনাদের এই কষ্ট পেতে হত না। যারা আপনাদের এই হাল করেছে তাদের আমরা খুঁজে বের করবই। বুঝতেই পারছেন আমরা বন্ধের বিরোধিতা করায় ওরা হতাশ হয়ে পড়ে এই সব কাজ করছে।'

সাংবাদিক ভদ্রলোক কোনও রকমে বললেন, 'ওরা বন্ধ-এর সমর্থক নয়, বন্ধ বিরোধী।'

'না বন্ধু। আমি গোরা দত্ত, দায়িত্ব নিয়ে বলছি ওরা আমাদের কেউ নয়। হরনাথদা, আমার নাম করে ওরা চা চেয়েছিল, আপনি না দিয়ে ঠিক কাজ করেছেন। কিন্তু এখনই আপনাদের হাসপাতালে যাওয়া দরকার। ক্যামেরাম্যান বন্ধু দেখছি বেশ আহত হয়েছেন। বিজুরির হেলথসেন্টারে গেলে তেমন চিকিৎসা হবে না। আপনারা এখনই ভক্তহাটে চলে যান।' গোরা দত্ত বলল।

সাংবাদিক ভদ্রলোক গগনকে দেখিয়ে বললেন, 'ওরা ওঁকে আপনাদের পার্টির লোক বলল। কোনও এক বিকাশদার বন্ধু।'

'এই অঞ্চলে বিকাশ নামের পাঁচ-ছয়জন লোক রয়েছে। আর উনি কি করে আমাদের পার্টির লোক হবেন? আচ্ছা, আপনি কি কখনও পার্টির মিটিং মিছিলে এসেছেন?'

'না।' গগন বলল।

সাংবাদিকের দিকে তাকাল গোরা দত্ত, 'তা হলে দেখুন। কীভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে। আর হ্যাঁ, আপনারা যদি নিউজ কভার করতে আসেন, তা হলে আমাদের এসকর্ট নিয়ে এলেই ভাল কাজ করবেন।'

গোরা দত্ত আবার মোটরবাইকের দিকে এগিয়ে যেতে হরনাথদা বললেন, 'গোরাবাবু, একটা কথা। ওদের আগে আরও বত্রিশ জন আপনার নাম করে চা খেয়ে গেছে। বলেছে আপনার কাছ থেকে দাম নিতে।'

'সর্বনাশ! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। যে কেউ আমার নাম করে চা চাইলে আপনি দিয়ে দেবেন? আজকের আগে কেউ আমার নাম করে চা চেয়েছিল?'

'না।'

'তা হলে? এবার হয়তো দেখব এরা বলছে আমিও বন্ধ করেছি।' গোরা দত্ত আবার মোটরবাইক চেপে বিজুরির দিকে চলে গেল।

বেশি আহত ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে বাকি দু'জন যখন সুমোতে উঠছে তখন হরনাথদা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ সব ব্যাপার আপনারা টিভিতে দেখাবেন নাকি?'

'কী করে দেখাব? ক্যাসেট তো নিয়ে গেছে ওরা।'

'যদি মুখেও বলেন, তা হলে দয়া করে আমার চায়ের দোকানের কথা বলবেন না। উপকার চাইছি না ভাই কিন্তু দয়া করে অপকার করবেন না।'

সুমো চলে গেল ভক্তহাটের দিকে।

চায়ের দাম দিতে গেল গগন। হরনাথদা মাথা নাড়লেন, 'থাক ভাই। ভেবে নেব তেত্রিশটা চা খাইয়েছি গোরা দত্তকে। মুখের ওপর দিনকে রাত করে গেল। কাল সকালে এখানে এসে দেখব হয়তো দোকানটাই নেই। ওদের জিজ্ঞাসা করলে বলবে, কোনও দিন এখানে কোনও দোকান তো দেখিনি! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আপনার?'

বাড়িতে ফিরে এল গগন। ঘড়ি দেখেনি, এসে দেখল মা বাইরে যাওয়ার জন্যে

আমারবই.কম

তৈরি। তাকে দেখে মা বলল, 'তোকে বললাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, কথা কানে নিলি না!'

'গোলমালের জন্যে আটকে গিয়েছিলাম।'

'কী গোলমাল?'

'পরে বলব। তুমি চলে যাও, আমি স্নান করে নিজেই খাবার নিয়ে নেব।'

'আমি সব সাজিয়ে ঢেকে রেখেছি। ঢাকনা খুলে খেয়ে নিলেই হবে।'

বাইরে থেকে গলা ভেসে এল, 'কাকিমা, আমি এসে গেছি।'

'আসছি, আসছি।' জানান দিয়ে মা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি খাওয়ার পরে আবার বেরুবি? তেমন কাজ না থাকলে আমি ফিরলে বাইরে যাস।'

হেসে ফেলল গগন, 'তুমি চিন্তা কোরো না। আমি বাড়িতেই আছি।'

মা চলে গেল। স্নান সেরে খেতে বসে গগনের মনে হচ্ছিল চারপাশের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পালটে যাচ্ছে মানুষের মুখগুলো। পার্টির আঞ্চলিক নেতা, সাংসদের ডান হাত যে তারও ডাহা মিথ্যে বলতে একটুও অসুবিধে হল না? নিজের দলের মাস্তানি বিরোধী দলের বলে চালিয়ে দিয়ে গেল? বিকাশকে গোরা দত্ত ভাই বলে ডাকে অথচ সাংবাদিক যখন নাম বলল তখন চিনতেই পারল না। হ্যাঁ, তার সঙ্গে গত তিন চার বছর ওর দেখা হয়নি কিন্তু বিজুরির নেতা শিবচরণপুরের ছেলেকে চিনতে পারবে না এ হতেই পারে না। পার্টির মিটিং, মিছিলে সে অনেক বার গিয়েছে। কিন্তু যায়নি বললে গোরা দত্তের সুবিধে হবে বুঝতে পেরে ওই উত্তরটা দিয়েছিল। তাতে লোকটা একটুও অবাক হল না? আচ্ছা, সে যদি বলত, আমি আপনাদের পার্টির সমর্থক, মিটিং-মিছিলে বহু বছর থেকে যাচ্ছি, তা হলে গোরা দত্ত কী বলত?

বদলে গেছে শিবচরণপুরের মা-মেয়েরাও। তা না হলে সাততাড়াতাড়ি মা ছুটত না কালীমন্দিরের সামনে। কিন্তু সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছে কে? এই গ্রামে বিরোধী দলের এমন কোনও মহিলা নেই যে বক্তৃতা দিতে পারে। মহিলাদের জমায়েতে একজনকে তো নেতৃত্ব দিতে হবে। হঠাৎ তার মনে পড়ল অনেক দিন আগে স্বপনদার মিটিং-এ শোনা একটা লাইন। কেউ নেতা হয়ে জন্মায় না, নেতৃত্ব জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সঠিক আন্দোলন শুরু হলে জনগণের ভেতর থেকেই নেতা বেরিয়ে আসেন। এখানকার মহিলাদের

জমায়েতে সেই রকম কিছু কি হল? যাই হোক না কেন, ঘরে বাইরের মানুষ বদলে যাচ্ছে দ্রুত।

খেয়েদেয়ে শুয়েছিল গগন। গত দু' রাত যেভাবে কেটেছে, আসা-যাওয়ার যে পরিশ্রম হয়েছে, তাতে এখন ঘুম এসে গেল সহজেই।

ঘুম ভাঙতেই মায়ের গলা কানে এল। 'ইস, গোটা বাড়ি অন্ধকার হয়ে আছে। দাঁড়াও ভাই, আগে আলোগুলো জ্বালাই।'

মায়ের সঙ্গে কেউ আছে। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। সন্ধে নেমে গেলেও শরীরে আলস্য জেঁকে ছিল। ঘরের আলো জ্বেলে মা বলল, 'এ কি? তুই এখনও ঘুমাচ্ছিস?'

বাধ্য হয়ে উঠে বসল গগন। মা বলল, 'একটু বাইরে আয়।'

পাজামার ওপর ফতুয়া গলিয়ে ভেতরের বারান্দায় পা দিতেই গগন দেখল উঠোনের ওপাশের কলঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। মেয়েটির হাতে মায়ের গামছা। রান্নাঘর থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, 'গামছাটা বারান্দার তারে মেলে দাও।'

গগন কলঘরে ঢুকল। মেয়েটি কে? এই গ্রামের মেয়ে হলে সে কি চিনতে পারত না। যেভাবে কলঘর থেকে বের হল তাতে যেন শহরের ছাপ আছে। মায়ের সঙ্গে আলাপ হল কোথায়? আজ অবধি মা কখনও কোনও অপরিচিত মানুষকে বাড়ির ভেতরে ডেকে আনেনি। হঠাৎ যেন সব কিছু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

মুখ ধুয়ে মুছে বাইরে পা দিতেই মায়ের গলা শুনল, 'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবি?'

ওবেলায় খাওয়া হয়েছিল, গগন বলল, 'না।'

'আমি বন্যার জন্যে ওমলেট বানাচ্ছি, খাবি কি না বল।'

'না।'

এই সময় ভেতরের বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়েটি হাত জোড় করে বলল, 'আমি বন্যা রায়। আপনার মা আজ রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'ও।'

'আশ্রয় দেওয়া কী বলছ? তুমি অত দূর থেকে এসে আমাদের সব কিছু জলের মতো বুঝিয়ে দিলে, তুমি তো আপনজন। পর হলে কি আসতে?' মায়ের গলায় বেশ খুশি খুশি ভাব।

আমারবই.কম

গগন চলে এল নিজের ঘরে। এই মেয়েটি, যার নাম বন্যা, শিবচরণপুরের মেয়েদের জমায়েতে নিশ্চয়ই বক্তৃতা দিয়েছে। কিন্তু এল কোত্থেকে? বোঝাই যাচ্ছে এ মেয়ে বিরোধী দলের সমর্থক। সরকারি পার্টির কয়েক জন মেয়েকে মিছিলে দেখা যায় বটে কিন্তু বিরোধী দলে তেমন কেউ নেই। নিশ্চয়ই যতীনরা তাদের কলকাতার মূল অফিসে যোগাযোগ করেছিল। তারাই বন্যাকে পাঠিয়েছে এখানে। এখন সরকারি পার্টি বলবে বাইরের লোক এসে গ্রামের মেয়েদের খ্যাপাচ্ছে। এবং সেই মেয়েকে মা আদর করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এল। এই ঘটনা জানলে ওরা গগনকে পার্টিবিরোধী বলে প্রচার করে। গগন এখনও বিশ্বাস করে পার্টির ওপরতলায় যাঁরা আছেন, সেই রাজ্যনেতাদের অনেকেই সৎ মানুষ। তাঁরা সাধারণ মানুষের ভাল চান। সবাই যদি গোরা দত্তের মতো অসৎ হত তা হলে তিরিশ বছর ধরে পার্টি ক্ষমতায় থাকতে পারত না। কিন্তু সেই সব সৎ নেতাদের কাছে সহজে পৌঁছানো যায় না। তাদের থাকতে হবে গোরা দত্তদের নির্দেশ মেনে। আজ গোরা দত্তের যে চেহারা সে দেখেছে, তারপর ওর নেতৃত্বে পার্টি করার কোনও বাসনাই তার নেই।

'চা হয়ে গিয়েছে।' মায়ের গলা ভেসে এল।

গগন বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দায় এককোণে তিনটে বেতের চেয়ার আর ছোট টেবিল রাখা থাকে। মা আর বন্যা তার দুটোয় বসে। গগন চায়ের কাপ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই খেতে আসেনি দুপুরে?'

'হ্যাঁ। তুই আসার আগেই খেয়ে বেরিয়ে গেছে। ফিরবে এখনই।'

'ও একটু বাড়াবাড়ি করছে।' গগন বলল।

'তাই যদি মনে হয় তা হলে তুই ওকে বুঝিয়ে বলিস।'

তৃতীয় চেয়ারে বসে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

'শেওড়াফুলিতে। ওখানকার স্কুলে পড়াই।'

'আজ এখানে এলেন কীভাবে। বাস তো এ দিকে আসছে না।'

'ভক্তহাট থেকে আধ মাইল দূরে বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরেছিল। ওখান থেকে হাঁটতে হয়েছে। বোধহয় চার কিলোমিটার পথ।'

'তা হলে আপনি এখানে আসবেন বলেই বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমাদের কাছে অনুরোধ গিয়েছিল এই গ্রামের মেয়েদের কাছে সমস্যাটা তুলে ধরতে কেউ যদি আসেন। আমি নিজেই চলে এলাম।' বলে

মায়ের দিকে তাকাল বন্যা, 'আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতাম। আপনি ভয় না দেখালে—।'

'তুমি এখানকার যে কোনও লোককে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ, সবাই এক কথা বলবে।'

মাথা নাড়ল বন্যা, 'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'তা হলে ভয় পেলে কেন?' মা জিজ্ঞাসা করল।

'ওই তো মুশকিল! জানি ও সব মানুষের কল্পনা কিন্তু ভয় ভয় ভাবটাও তো কাটাতে পারি না। অদ্ভুত ব্যাপার।' বন্যা হাসল।

চা খেয়ে কাপ রেখে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'কীসের ভয় দেখালে মা?'

'ভয় দেখাইনি। বেহ্মোমারির বটগাছটার কথা বলেছি ওকে। সন্ধে হয়ে গেলে লোকে ওর নীচ দিয়ে যেতে ভয় পায়। বহু পুরনো গাছ। কেউ কেউ নাকি ওই গাছে কীসব দেখেছে। তা যাই হোক, এই মেয়েটা চার কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে রাত্তিরবেলা বাস পাবে কি পাবে না, তার চেয়ে আজ আমাদের ওখানে থেকে কাল গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।' মা বলল, 'তোমার বাড়ির লোক চিন্তা করবে না তো?'

'মা ভাববে। বলে এসেছিলাম আজই ফিরব।' বন্যা বলল, 'যদি একটা ফোন করা যেত তা হলে ভাল হত। এখানে ফোনের বুথ নেই?'

'আছে। নাম্বারটা গগনকে দাও, ও গিয়ে ফোন করে দেবে।'

'না না। তা হলে মা ভুল বুঝবে। আমি নিজেই গিয়ে ফোনটা করে আসি।' উঠে দাঁড়াল বন্যা, 'কোন দিকে যাব?'

মা বলল, 'তুই ওর সঙ্গে যা গগন।'

অতএব উঠতে হল গগনকে। সে লক্ষ করল বন্যা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে এল। কয়েক পা হাঁটতে স্লোগান শুনতে পেল ওরা, 'ধাপ্পা দিয়ে জমি দখল মানব না মানছি না।' জনা যাটেক মানুষ আধা অন্ধকারে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে বন্যা বলল, 'আপনার মায়ের কাছে শুনলাম আপনি কলকাতায় থাকেন। এখানে কি আন্দোলনের জন্যে এসেছেন?'

'আন্দোলন?' হোঁচট খেল গগন, 'দেখুন, দু'দিন আগেও আমি ভাবিনি এখানে যা হবে তাকে আন্দোলন বলা যাবে। সাত দিনের ছুটি পেয়ে চলে এসেছি।'

আমারবই.কম

‘আপনার মা বলছিলেন আপনাদের এক ফসলি জমি আছে।’

‘হ্যাঁ। তা আছে।’

আর কোনও কথা হল না। রতনের বুথের সামনে বেশ ভিড়। অনেকেই লাইন দিয়ে আছে। গগন দেখল বন্যা সেই লাইনের পেছনে দাঁড়াল। হঠাৎ একজন তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে দিদি, আপনি কেন লাইনে দাঁড়িয়েছেন?’

‘বাড়িতে একটা ফোন করব।’

‘এই রতন, দিদিকে আগে ফোন করতে দাও।’ যে লোকটা চেঁচাল তার নাম বঙ্কিম। স্কুলে পড়ায়।

লাইনে দাঁড়ানোদের মধ্যে দু’জন বলল, ‘আমরা তো লাইনে আছি।’

বঙ্কিম বলল, ‘হ্যাঁরে ভাই। তোরা এই গ্রামের ছেলে। আর দিদি বাইরে থেকে এসে গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে আজ সভা করেছেন। তার সম্মান দিবি না?’

গগন দেখল বেশ অস্বস্তি নিয়ে এগিয়ে গেল বন্যা। গিয়ে ঝটপট কথা শেষ করল। রতনকে টাকা দিয়ে লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের নমস্কার করে বন্যা এগিয়ে এল, ‘ফোনটা না করলে মা সারা রাত জেগে থাকত। চলুন।’

বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করল ওরা। গগন জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি অনেক দিন থেকে রাজনীতি করছেন?’

বন্যা বলল, ‘কলেজে ঢোকার পর থেকে। কেন?’

‘তা হলে তো আপনার বাড়ির বাইরে থাকার ব্যাপারটার সঙ্গে পরিবারের সবাই এত দিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। বাড়ি না ফিরলে ওরা ভেবে নেবেন দলের কাজে আটকে গেছেন।’

‘যদি বুঝি ফিরতে পারব না, দূরত্ব অনেক। তা হলে বাড়িতে বলে যাই। কাছাকাছি কোথাও গেলে যেমন করে হোক আমি ফিরে যাই। এখান থেকেও যেতে পারতাম কিন্তু আপনার মা এমন করে বললেন যে না বলতে পারলাম না।’ বন্যা হাসল।

অন্ধকার ফুঁড়ে একটা ছেলে সাইকেলে চেপে চলে এল ওদের পাশে। ছেলেটি বলল, ‘গগনদা, আপনাকে যতীনদা এক্ষুনি ডেকেছেন।’

‘কেন?’

‘একটা মার্ডার হয়েছে। আপনি কি আমার সাইকেলে যাবেন?’

‘কোথায় আছে সে?’

‘স্কুলের পাশের ক্লাবঘরে।’

‘ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।’

ছেলেটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে বন্যা বলল, ‘আমি এখান থেকে আপনাদের বাড়িতে চলে যেতে পারব। নিশ্চয়ই কোনও জরুরি ব্যাপার, আপনি চলে যান।’

হাঁটতে হাঁটতে গগন বলল, ‘যতীন আমাকে ডাকলেই যে ছুটতে হবে এমন ভাবার কোনও কারণ ঘটেনি। যতীন যে রাজনীতি করে তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ ওদের রাজনীতির কোনও ভিত্তি নেই। কোনও আদর্শ নেই। শুধু বিরোধিতা করার জন্যে ওরা মুখিয়ে থাকে। কিন্তু আজ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যে আমার এত দিনকার ভাবনাচিন্তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তাই যতীনের ওখানে যাব কিনা ভাবতে পারছি।’

বন্যা দাঁড়াল, ‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি সরকারি পার্টির সাপোর্টার। তা হলে আমাকে বাড়িতে থাকতে দিলেন কেন?’

মাথা নাড়ল গগন, ‘আপনাকে মা ডেকে এনেছেন। উনি কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না। ঠিক আছে, আপনি বাড়িতে যান, আমি ঘুরে আসছি।’

গগনের আচমকা এই পরিবর্তনে অবাক হল সে। এখন গগনদের মতো অনেকেই যে দ্বিধায় দুলবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গগন তাকে কোন দলের সমর্থক বলে ভেবেছে? কলেজ জীবন থেকে সে যে দলের সমর্থন করে এসেছে তাদের ঐতিহ্য আছে, আদর্শ আছে, শুধু প্রতিবাদ করার জন্যেই ওই দলের জন্ম হয়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথম থেকেই এই দলের কথা বলতে হবে। তা হলে?

স্কুলের মাঠের পাশে শিবচরণপুর যুবক সঙ্ঘের ক্লাবে লোক গিজ গিজ করছে। গগন সেখানে বিরোধী দলের এম এল এ থেকে শুরু করে অনেক নেতাকে দেখতে পেল। ওঁরা নিজেরা খুব গম্ভীর মুখে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গগন ভিড় ঠেলে এগোতেই যতীন তাকে দেখতে পেল। সে এম এল এ-কে নিচু গলায় কিছু বলতেই এম এল এ উঠে এলেন। যতীন বলল, ‘গগন ও দিকে চল।’

আমারবই.কম

ভিড় থেকে বেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে এম এল এ জিজ্ঞাসা করলেন, 'গগন আপনি আজ সকালে বিজুরির দিকে গিয়েছিলেন?'

অবাক হল গগন, 'হ্যাঁ। তবে ব্রিজ পার হইনি। বিজুরির এ দিকেই ছিলাম।'

যতীন জিজ্ঞাসা করল, 'হরনাথদার চায়ের দোকানে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আজ রাত্রে বাড়িতে থাকবেন না।' এম এল এ বললেন।

'কেন?' অবাক হল গগন।

'যতীন, ওকে বুঝিয়ে বল। আমি ও দিকের কথা শেষ করি।' এম এল এ আবার চলে গেলেন ক্লাব ঘরের দিকে।

'শোন। তোর বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ এনেছে ওরা।' যতীন বলল।

'কী যাতা বলছিস? আমি কাকে মার্ডার করব?' অবাক হয়ে গেল গগন।

'তুই কিছু শুনিসনি?'

'না।'

'আজ সন্ধের একটু পরে হরনাথদা খুন হয়ে গেছেন। ওর বডি বেক্কেমারি বটগাছের কাছে পাওয়া গিয়েছে। আজ সকালে দোকানে যাওয়ার পরে হরনাথদা বাড়িতে ফিরে যাননি। পুলিশ তদন্তে গেলে বিজুরির চারটে ছেলে বলেছে তুই নাকি দুপুর থেকে হরনাথদার সঙ্গে ছিলি। ওরা তোকে ঝগড়া করতে দেখেছে। আমরা খবর পেয়েছি আর একটু রাত হলে থানা থেকে পুলিশ আসবে তোকে ধরতে।' যতীন বলল।

'হরনাথদা খুন হয়ে গেছেন!' বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল গগনের।

'হ্যাঁ। কিন্তু তুই নিজের কথা ভাব। রাতটা কোথায় থাকবি?'

'এই তো শুনলাম। কিন্তু আমি বাড়ি ছেড়ে যাব কেন? পুলিশ এলে যা সত্যি তাই বলব। আমি একটা নাগাদ দোকান থেকে চলে এসেছিলাম। তখন হরনাথদা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। তা ছাড়া আমার সঙ্গে ঝগড়া দূরের কথা তর্কও হয়নি।'

'আজ রাত্রে সেটা প্রমাণ করতে পারবি?'

'প্রমাণ?' ফাঁপড়ে পড়ল গগন।

'পারবি না। ওরা তোকে ধরে নিয়ে যাবেই। বিজুরির ছেলেগুলো তো নিজের ইচ্ছায় গল্পটা বানায়নি, কেউ শিখিয়ে দিয়েছে।'

'গোরা দত্ত এসেছিল চায়ের দোকানে। ওর পার্টির ছেলেরা বত্রিশ কাপ চা

খেয়ে গিয়েছিল। হরনাথদা দাম চাইতে ওকেই দোষ দিল গোরা দত্ত। বলল, কেন হরনাথদা বাকিতে চা দিয়েছে। ওর লোক তিন জন টিভি সাংবাদিককে মেরেছিল। গোরা দত্ত তাদের বলে গেল তার পার্টির কেউ মারেনি। মেরেছে যারা বন্ধ করেছে তাদের গুন্ডারা। তখন গোরা দত্ত আমার সঙ্গেও কথা বলেছে।'

'হরনাথদাকে খুন করে তোর ঘাড়েই দোষ চাপাতে চাইছে ওরা। তুই এক কাজ কর। একটা সাইকেল নিয়ে বিলের ওপাশে গোবর্ধনের মাছের গুদামে চলে যা। গোবর্ধনকে বলে দিচ্ছি। আর কাউকে বলার দরকার নেই।' যতীন বলল।

'আমার তো সাইকেল নেই।'

'তুই বাড়িতে বলে গোবর্ধনের বাড়িতে চলে যা। ওখানে সাইকেল পাবি। যা।' যতীন পিঠে হাত দিল, 'আমি কাল সকালে তোর সঙ্গে দেখা করব।'

বাড়িতে ফেরার সময়ে মাথায় সন্দেহটা এল। যতীন বা এম এল এ সত্যি কথা বলছে তো? হরনাথদাকে নিয়ে অত বড় মিথ্যে নিশ্চয়ই বলবে না কিন্তু তাকে দলে টানতে গল্পটা বানায়নি তো? গোরা দত্তের লোকেরা যদি পুলিশকে তার কথা বলে আর পুলিশ যদি তাকে খুনি ভেবে নেয়, তা হলে পার্টির ওপর তার কোনও দুর্বলতা আর থাকবে না। যতীনরা এই ভাবে তাকে দলে পেতে চাইতে পারে। তাছাড়া একই দিনে বন্যা শিবচরণপুরে পড়তে দিতে এল. মা তাকে বাড়িতে ডেকে আনল আর পুলিশ তাকে খুঁজতে আসবে— এটা কীরকম কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না।

কিন্তু সন্দেহটা জোরদার হচ্ছে না কিছুতেই। যদি সত্যি হয় তা হলে পুলিশ একবার ধরতে পারলে তাকে সহজে ছাড়বে না। যদি প্রমাণ সাজাতে পারে তা হলে ভয়ংকর শাস্তি হয়ে যাবে। মামলা করতে গেলে উকিলকে টাকা গুনিয়ে যেতে হবে। তার চেয়ে আজ রাত্রে গা ঢাকা দিয়ে দেখা যাক সত্যি পুলিশ আসে কি না।

বাড়িতে ঢুকে গগন দেখল মা ছোটভাইকে খেতে দিয়েছে। পাশে একটা মোড়ায় বসে বন্যা গল্প করছে। তাকে দেখে মা জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে, খেয়ে নিবি।'

'চটপট দাও।'

'চটপট কেন? তুই আর বন্যা একসঙ্গে খেতে বস।'

বন্যা বলল, 'আমি এত তাড়াতাড়ি খাব না। আপনার সঙ্গে বসব।'

আমারবই.কম

হাত ধুয়ে ভাই-এর পাশে বসে গগন বলল, 'সারা দিন তো টো টো করে ঘুরলি। কাল থেকে যেন এটা না হয়!'

ভাই প্রতিবাদ করতে চাইল। ওর মুখ থেকে গোঙানি বের হল।

'ও সব বলে কোনও লাভ হবে না। যদি যেতে ইচ্ছে করে সকালের দিকে যাবে। বিকেলের পর বাড়ি থেকে বের হবে না।' গগন গম্ভীর গলায় বলল।

মা ভাতের থালা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্যা বলছিল কেউ নাকি মার্ডার হয়েছে। যতীন তাই ডেকেছিল তোকে?'

'হ্যাঁ। হরনাথদা খুন হয়েছে।' খেতে খেতে বলল গগন।

'অ্যাঁ। সেকী?' মা চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন? কে খুন করেছে?'

'কেন তা জানি না। খুনি কে তাও জানি না। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'আমাকেই নাকি হরনাথদার সঙ্গে শেষ দেখা গেছে। বিজুরির লোকজন তাই বলেছে পুলিশকে। আমি বাড়িতে ফিরেছি দুটোর সময়। উনি খুন হয়েছেন সন্ধের পরে। তবু নাকি পুলিশ আমাকে খুঁজতে আসবে।' গগন বলল।

'আসে আসুক। তুই সত্যি কথা বলবি।'

'না কাকিমা।' বন্যা বলল, 'সত্যি কথা শোনার সময় ওদের নেই। কাউকে খুনি বানিয়ে দিতে পারলেই ওদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।'

গগন বলল, 'একটা প্যান্ট শার্ট আর গামছা কাপড়ের ব্যাগে ভরে দাও। আমি খেয়েই বেরিয়ে যাব।'

'কোথায় যাবি? এখন তো কলকাতার বাস পাবি না।'

গগন বন্যার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'কলকাতায় যাচ্ছি না। যেখানেই থাকি তোমাকে জানিয়ে দেব।'

'আশ্চর্য! এখন বলতে দোষ কী!' মা গম্ভীর হল।

'কারণ আমি এখনও জানি না কোথায় থাকতে পারব। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি যেখানে থাকি ভালই থাকব।'

'তা হলে কিছু টাকা দিয়ে দিই।'

'আমার কাছে আছে।'

'যদি পুলিশ আসে তা হলে কী বলব?'

গগন মুখ খোলার আগে বন্যা বলল, 'যেহেতু খুনটা সন্ধের পরে হয়েছে,

তাই বললে হয় উনি দুপুরে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বর্ধমানে গেছেন।'

অবাক হয়ে মা জিজ্ঞাসা করল, 'ও'মা, বর্ধমান কেন?'

'কলকাতায় গেছেন বললে ওঁর ঠিকানা আপনার কাছে চাইবে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করলে জানতে পারবে উনি কলকাতায় যাননি।' বন্যা বলল।

হেসে ফেলল গগন, 'বাঃ। আপনি খুব ভাল পরামর্শ দিলেন। চট করে আমার মাথায় আসত না। মা, আমি বর্ধমানে গিয়েছি কিন্তু কোথায় উঠেছি তা তুমি জান না। চুকে গেল।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে গগন যখন বেরুতে যাচ্ছে তখন মা কেঁদে ফেলল। গগন তাকে সতর্ক করল, 'কাঁদছ কেন? তোমার কান্না কারও কানে গেলে সে-ই পুলিশকে জানিয়ে দেবে এই সময়ে আমি চলে যাচ্ছি বলে তুমি কেঁদেছ।'

চট করে কান্না গিলে ফেলল মা।

শিবচরণপুরের রাস্তার আলো এমনিতেই টিম টিম করে, আজ বোধহয় নিভিয়ে দিয়েছে কেউ। মিনিট বারো হেঁটে গোবর্ধনের দোতলা বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই একটা সাইকেল নিয়ে গোবর্ধন বেরিয়ে এল, 'তোকে কেউ দ্যাখেনি তো?'

'বোধহয় না।'

'আমার মাছের গুদামটা চিনিস তো?'

'দেখেছি।'

'সোজা চলে যা। ও পাশের রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। গুদামে কার্তিক থাকে। ও একটু আগে দরকারে এসেছিল, সব বলে দিয়েছি। একটু আঁশটা গন্ধ ছাড়া কোনও অসুবিধে হবে না। যা।'

গোবর্ধনের সাইকেলে চেপে মাঠের পথ ধরল গগন। ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও ক্রমশ তারার আলোয় পথ একটু আবছা হল। বিলের পাশ দিয়ে খাদায় যাওয়ার রাস্তা ধরে আধঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে সে গোবর্ধনের গুদামে পৌঁছে গেল। সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতেই হ্যারিকেন হাতে নিয়ে কার্তিক বেরিয়ে এল। লোকটার সঙ্গে কোনও দিন কথা হয়নি। গুদাম ছেড়ে নড়ে না সাধারণত। সত্তরের কাছে বয়স। এখানে একাই থাকে বোধহয়। খালি

আমারবই.কম

গা, লুঙ্গি পরা, খাটো চেহারার কার্তিক বলল, 'আসুন বাবু। গুদামের ভেতর সাইকেল রাখুন।'

অনেকটা বড় হলঘরের মতো মাছের গুদাম। কিন্তু ভেতরে পা দেওয়া মাত্র মাছের আঁশটে গন্ধ শরীরে ঢুকে পাক দিয়ে গেল। গগনের মনে হল বমি হয়ে যাবে। তা দেখে কার্তিক হাসল, 'প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে বাবু, অভ্যেস হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'এখানে আমাকে থাকতে হবে নাকি?'

'না না। সাইকেলটাকে রেখে ওই ও পাশের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলুন।'

কার্তিককে অনুসরণ করে কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ঘরে আসতে মনে হল গন্ধের ঝাঁঝটা কমে গেছে অনেকটা। কার্তিক বলল, 'বড়বাবুর কাছে শুনে এসে এই বিছানা পেতে দিয়েছি। ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নামলে বাথরুম পায়খানা পাবেন। বাবু কি না খেয়ে আছেন?'

গগন বলল, 'আমি খেয়ে এসেছি।'

'তা হলে আপনি শুয়ে পড়ুন বাবু।' বাইরের দরজা বন্ধ করে দিল কার্তিক, 'শোওয়ার সময় এই দিকের দরজাও বন্ধ করে দেবেন। পেছনেই তো বাদার শুরু। পোকামাকড় ঢুকে পড়ে। হ্যারিকেনটা কি রেখে যাব বাবু?'

'মোমবাতি নেই?'

'হ্যাঁ। এই যে এখানে মোম আর দেশলাই আছে?' কার্তিক দেখিয়ে দিল। মোমের আলো জ্বেলে হ্যারিকেন নিয়ে নেমে গেল কার্তিক।

গরম লাগছিল গগনের। সামনের জানলাটা খুলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে হাওয়া ঢুকতে লাগল ঘরে। গগন জানলার গায়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। এটা গুদামের পেছন দিক। আধা অন্ধকারে সামনের চরাচর রহস্যময় মনে হচ্ছে। এখান থেকে বাদার শুরু। এই বাদা পেরিয়ে গেলে আলতা নদীর দেখা পাওয়া যাবে। আকাশ থেকে চুঁইয়ে আসা আলো ঝোপঝাড়গুলোকে স্পষ্ট করেনি। হাওয়ার দাপটে মোমবাতি নিভে গেল। জামা ছেড়ে পাজামা পরে বিছানায় চলে এল গগন।

যতীনের খবর যদি সত্যি হয় তা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই একটু পরে বাড়িতে ঢুকবে। ওরা নিশ্চয়ই খবর রাখবে বাড়িতে কে কে আছে। মায়ের সঙ্গে কথা বলার পরে যদি সন্দেহমুক্ত না হয় তা হলে তল্লাশি চালাবে নিশ্চয়ই। তখন

বন্যাকে দেখতে পেয়ে পরিচয় জানতে চাইবে। বন্যা যে বিরোধী দলের কর্মী, সভা করতে এসেছিল শিবচরণপুরে, এটা যদি জানতে পারে তা হলে নিশ্চয়ই জলঘোলা করবে। তবে বন্যার সঙ্গে কথা বলার পর মনে হয়েছে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা সে করতে পারে। এরকম মেয়ে আগে কখনও দেখেনি গগন।

ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে ঢোকামাত্র ঘুম ভেঙে গেল তার। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। দ্বিতীয়বার চিৎকার শুরু হতেই থেমে গেল। কিন্তু একটি পুরুষ কণ্ঠ কানে এল, 'এই চুপ চুপ একদম চুপ। নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব। ওপরে বড়বাবুর বন্ধু ঘুমাচ্ছে। একটা শব্দও যেন বের না হয়।"

গগন অপেক্ষা করল। কিন্তু আর কোনও চিৎকার শোনা গেল না। ব্যাপারটা কী? খুব কষ্ট-ভয়-যন্ত্রণা পেলে কোনও মেয়ে ওইরকম চিৎকার করতে পারে। চিৎকারটাকে থামাতে ওর মুখে চাপা দেওয়া হয়েছিল। গলার স্বর যদি কার্তিকের হয় তা হলে মেয়েটা কে? ওর বউ? ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল গগন। এখন এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে নীচে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আবার চিৎকার হলে দেখা যাবে।

ভিড়টা জমেছিল রাস্তার ওপাশে। পুলিশের জিপটা গ্রামে ঢুকতে দেখেই মুখে মুখে খবরটা ছড়ালেও প্রবল উৎসাহী ছাড়া বাকিরা আড়ালে থেকেছে। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দারোগা বললেন, 'তা হলে আপনি বলছেন গগনবাবু দুপুরেই বর্ধমানে গিয়েছেন ইন্টারভিউ দিতে। কিন্তু কোথায় উঠেছেন, চাকরিটা কোথায় তা আপনি জানেন না?'

'না।' মা বলল।

'কিন্তু দুপুর অবধি তাকে লোকে হরনাথের চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেছে।' দারোগা বললেন, 'আপনার কথা সত্যি হলে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন। আপনাকে মিথ্যে বলেছেন। কোনও ইন্টারভিউ হয় না।'

'ছেলে যা বলেছে তাই আপনাকে বললাম।'

দু'জন সেপাই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জানাল কাউকে পাওয়া যায়নি। দারোগা বললেন, 'ঠিক আছে। ছেলে তো ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়িতে

আমারবই.কম

ফিরবেই। তখন তাকে বলবেন থানায় গিয়ে দেখা করতে।'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মা।

দারোগা সেপাইদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। জিপ আসছে পেছন পেছন। জনতা জিপের পেছনে থেকে তাদের অনুসরণ করছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দারোগাবাবু হুংকার দিলেন।

'অ্যাই! মাঝ রাত্রে মজা দেখতে আসা হয়েছে? যান, বাড়ি যান। চটপট ক্লিয়ার হয়ে যান। নইলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো উলটোমুখো হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

যদুনাথের বাড়ির সামনে এসে দারোগাবাবু দাঁড়ালেন, 'যদুবাবু জেগে আছেন নাকি।'

যেন ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন, তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন যদুনাথ। 'যা অরাজকতা চলছে চারপাশে, ঘুমুতে পারছি না বড়বাবু।'

'খুব স্বাভাবিক। এই দেখুন, আমাকেও মাঝ রাতে ছুটে আসতে হল।'

'হ্যাঁ। সেই নির্বাচনের সময় পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন কথা বলবেন, আসুন, ভেতরে আসুন।' যদুনাথ ডাকলেন।

'না না। এত রাত্রে ও সব থাক। আচ্ছা, এই গগন ছেলেটা কীরকম?'

'কলকাতায় ড্রাইভারি করে। এখানে তো থাকেই না।'

'রাজনীতি করে?'

'না না। অবশ্য কলকাতায় ওসব করে কিনা জানি না। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'হরনাথ চা-ওয়ালা খুন হয়েছে। খুনি হিসেবে ওকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। দারোগাবাবুর কথা শেষ হওয়া মাত্র দরজায় এসে চিৎকার করে উঠল ঝরনা, 'মিথ্যে কথা। গগনদা কখনওই কাউকে খুন করতে পারে না। ওরকম মানুষই না।'

'অ্যাই চোপ। আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে তুই কথা বলার কে?' যদুনাথ ধমকালেন।

'একশোবার বলব। তুমি তো গগনদার বিরুদ্ধে এখন বানিয়ে বানিয়ে সাতকথা বলবে। জমি বিক্রি করেনি বলে ওকে তুমি শত্রু ভাবছ, তা জানি না।'

'অ্যাই! মেরে মুখ ভেঙে দেব।' এগিয়ে গেলেন যদুনাথ।

দারোগাবাবু হাঁ হাঁ করে বললেন, 'আরে হচ্ছেটা কী! শান্ত হোন যদুনাথবাবু। অত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলবেন না।'

যদুনাথ নিজেকে সংবরণ করে বললেন, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।'

'কেন যাব? আমি এই বাড়ির মেয়ে, এখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে মা। তাই থাকবে।' দারোগাবাবু কাছে এগিয়ে এলেন, 'তা হলে তুমি বলছ গগন খুন করতে পারে না?'

'না। গগনদার মধ্যে কোনও কুমতলব নেই।' ঝরনা বলল, 'তা ছাড়া বাবা সত্যি কথা বলেনি। গগনদা পার্টির সাপোর্টার। এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতে দাঁড়াবার জন্যে পার্টি থেকে বলেছিল ওকে। কিন্তু সময় দিতে পারবে না বলে গগনদা নিজে রাজি হয়নি। বিশ্বাস না করলে ভক্তহাটে গিয়ে স্বপনদাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।' ঝরনা শব্দ করে পা ফেলে ভেতরে চলে গেল।

হঠাৎ দূরে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। দারোগাবাবু বললেন, 'ছেলেটার ওপর একটু নজর রাখবেন তো। ও এখন বাড়িতে নেই। ফিরলেই জানিয়ে দেবেন।' দারোগাবাবু জিপে উঠে বসলে তার মুখ ঘুরিয়ে নিল ড্রাইভার। চেঁচামেচিটা আচমকা থেমে গেল। গ্রামের রাস্তায় এখন জনাদশেক ছেলের মিছিল শুরু হয়েছে। তারা স্লোগান দিচ্ছে, 'হরনাথকে খুন করল কে, পুলিশ তুমি জবাব দাও।' দারোগাবাবুর জিপ একটুও গতি না কমিয়ে মিছিলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

যদুনাথের বাড়ির সামনে থেকে দারোগাবাবু চলে যাওয়া মাত্র রাস্তার ওপারকার অন্ধকার থেকে যে লোকটি দ্রুত কাছে চলে এল তাকে যদুনাথ বিলক্ষণ চেনেন। গলা পর্যন্ত ধার করে বসে আছে, শোধ দেওয়ার সামর্থ্য নেই। ছেলে শোধ করছে বাপের ধার।

'কী মতলব?' যদুনাথ দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল।

'আহা। একটু দাঁড়ান না।'

'আমি তোমাকে বলে দিয়েছি আর একটা পয়সাও দিতে পারব না।'

'এই জন্যে লোকে আপনাকে বলে হাড় কঞ্জুস। আমি কি এখন ধার চাইতে এসেছি। পেটের ভেতর জব্বর খবর লাফাচ্ছে, মুখ দিয়ে বের করব?'

'মদন, কথা বাড়িয়ো না। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।' যদুনাথ বিরক্ত।

আমারবই.কম

'ওই গগনচন্দ্রের গর্ভধারিণী যে এক নম্বরের মিথ্যেবাদী তা আগে জানতাম না!'

বলে কী লোকটা। মুহূর্তেই বদলে গেলেন যদুনাথ। এমনকী দারোগাবাবুর সামনে মেয়ে যে তাঁকে অপমান করেছে সে কথাও ভুলে গেলেন। আবার দরজা খুলে হাসি মুখে বললেন, 'ছি মদন! বিধবা মায়ের সম্পর্কে অসত্য কথা বলো না।'

'অসত্য? গগনকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল। বাড়িতে পায়নি, আমরা রাস্তার ওপার থেকে শুনলাম ওর মা বলল গগন দুপুরবেলায় ইন্টারভিউ দিতে বর্ধমানে গিয়েছে।' শ্বাস ফেলল মদন, 'ডাঁহা মিথ্যে কথা। মদন সন্ধের পরে রতনের বুথে একটা মেয়েছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল ফোন করাতে। বিশ্বাস না হয় রতনকে জিজ্ঞাসা করুন, বঙ্কিমও সাক্ষী দেবে।'

'তা মদনচন্দ্র, কথাগুলো দারোগাবাবুর সামনে আমাকে বললে না কেন? মিথ্যে কথা বলার সাজা টের পাইয়ে দিতাম! তা হলে সন্ধেবেলায় গগনকে গাঁয়ে দেখেছ।'

'আমি কেন, সবাই দেখেছে ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে।'

'তখন থেকে, মেয়েছেলে মেয়েছেলে করছ, সেটা কে?'

'শুনলাম গাঁয়ের মেয়েদের মাথা চিবোতে এসেছে বাইরে থেকে। তা আপনার পার্টিতে দু'তিনটে আছে বটে কিন্তু তাদের দেখলে মনে হয় কালো পাটকাঠিতে ন্যাকড়া জড়িয়েছে, কিন্তু ইনি বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। গগনের পাশে যখন হাঁটছিল তখন মনে হচ্ছিল ছোড়াটার কপাল ভাল।' মদন হাসল।

'সে কি এখনও গাঁয়ে আছে?'

'আছে মানে? গগনের মায়ের পাশে বাড়ির বউ-এর মতো দাঁড়িয়েছিল।'

'সেকী! ওদের কি আগেই জানাশোনা ছিল?'

'মনে হয় না। ওই সভা-ফেরত এসেছে।'

'সভা-ফেরত আসবে কী করে? নিশ্চয়ই ডেকে এনেছে।' ইস, দারোগা যখন ছিল তখন যদি জানতে পারতাম!' আফশোসে মাথা নাড়লেন যদুনাথ।

'ভয়ে আসতে পারিনি। লোকে বলত চুকলি কাটছি। তা আপনি কাল সকালে থানায় গিয়ে জানিয়ে দিন না। পুলিশ রতনের বুথে গেলেই সব জেনে যাবে।' মদন গলা নামাল।

'দেখছি। এখন এসো।'

'এত খবর দিলাম, কিছু হবে না?' হাত পাতল মদন।

'ও, এই মতলবে আসা হয়েছে! এ সব খবরে আমার কী দরকার, অ্যাঁ? যা ভাগ এখান থেকে। রাত্তিরবেলায় একটু ঘুমাব, তারও জো নেই।' দরজা বন্ধ করে দিলেন যদুনাথ।

কয়েক সেকেন্ড বন্ধ দরজার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে মদন বলল, 'শালা!'

পুলিশ গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেলে মিছিল থেমে গিয়েছিল, শ্লোগানও বন্ধ হয়েছিল। এখন যে যার বাড়ি গিয়ে একটু না ঘুমালে কাল কাজকর্ম মাথায় উঠবে। বন্‌ধ শেষ হয়ে গেছে মাঝ রাত্রে। জমি রক্ষা কমিটি কাল দুপুরে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনায় বসবে। কিন্তু ওদের বাড়ি যাওয়া হল না। যতীন দেখল মদন বেশ জোরে তাদের দিকে হেঁটে আসছে। লোকটা নচ্ছাড়, কোনও কাজকর্ম করে না, শুধু ধার চেয়ে বেড়ায়।

মদন কাছে এলে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার মদন, ঘুমাওনি।'

মদন মাথা নাড়ল, 'সূর্য না উঠলে আমার চোখে ঘুম আসে না ভাই। লোকে যখন ঘুমায় আমি তখন জাগি।'

'ভাল কল করেছ। দিনে ঘুমালে পাওনাদারের সামনে পড়তে হবে না।' যতীন বলল, 'যাও সবাই। আর রাত জেগো না।'

'আমার তো রাত জাগা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তার ওপর যা শুনে এলাম তাতে তো ঘুম আসার কোনও চান্সই নেই।' মদন বলল।

'কী শুনলে?' দলের একজন জিজ্ঞাসা করল।

'আমি কি জানি ছাই পুলিশ এসেছিল গগনকে ধরতে! কোথায় নাকি কেউ খুন হয়েছে, তাই গগনকে সন্দেহ করছে পুলিশ। বাড়িতে পায়নি। ওর মা বলেছে সে বর্ধমানে গিয়েছে কাজের ধান্দায়। এসব আমারও শোনার কথা নয়। কিন্তু পুলিশ চলে গেলে যদুনাথদা আমায় ডাকল। জিজ্ঞাসা করল দিনের বেলায় আমি গগনকে দেখেছি কি না! বোকা বোকা কথা। দিনের বেলায় আমি দেখব কী করে? আমি তো তখন গভীর ঘুমে। ঘুম ভাঙল সন্ধের পরে। মুখে পায়ে জল দিয়ে রতনের টেলিফোন বুথের দিকে যেতে গিয়ে দেখলাম গগন একজন মেয়েছেলের সঙ্গে চলেছে। মিথ্যে বলতে তো পারি না, কেনই

আমারবই.কম

বা বলব? তাই যদুনাথদাকে বলেছি দিনের বেলায় তাকে দেখিনি কিন্তু সন্ধের পর টেলিফোন বুথে যেতে দেখেছি। শোনামাত্র যদুনাথদা খেপে লাল। বলল, গগনের মা পুলিশকে মিথ্যে বলেছে? তুই ওকে মিথ্যেবাদী বলছিস? আমি তখন ওঁর মুখে পুরো ঘটনাটা জানতে পারলাম। আমারও জেদ চেপে গেল। বললাম, ওই মেয়েছেলেটাকে নিয়ে ফোন করতে গিয়েছিল গগন। তুমি রতন, বঙ্কিমদের জিজ্ঞাসা করো। শুনে খুব খুশি হল যদুনাথদা।' মদন বলল।

'খুশি হল? কেন?' যতীন জিজ্ঞাসা করল।

'বলল গগনের বিষদাঁত এবার ভাঙব। কাল সকালেই থানায় গিয়ে বড়বাবুকে খবরটা দিয়ে আসব। আমি অনেক হাতে পায়ে ধরলাম। বললাম, গাঁয়ের ছেলেকে এই বিপদে ফেলো না। কিন্তু বুড়ো মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।' মদন বলল।

যতীন হাসল, 'না না এটা যদুনাথদা করবে না। গগনের বাবার বন্ধু ছিল তো। গগনকে জন্মাতে দেখেছে। এ নিয়ে তুমি ভেবো না। যাও, বাড়ি যাও।'

'একেবারে খালি হাতে বাড়ি যাব?'

'মানে?'

'পকেটে একটাও পয়সা নেই। ভোরে দোকান খুললে দু'টাকার মুড়ি কিনে খেতে খেতে বাড়ি যাব। দাও, দুটো টাকা দাও।' হাত বাড়াল মদন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা টাকা বের করে যতীন বলল, 'দশ গোনার আগে এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে নইলে ওটা ফেরত নিয়ে নেব।'

মাঝরাত্রে ঘুম এসেছিল গগনের। কার্তিক দরজায় শব্দ করায় ঘুম ভাঙলে দেখল রোদ ওঠেনি কিন্তু দিন হয়ে গেছে। জানলার বাইরে, আকাশটায় মেঘ ভর্তি।

দরজা খুললে কার্তিক বলল, 'বড়বাবু এসেছেন।'

'কোথায়?'

'নীচে। আপনার জন্যে ফ্ল্যাস্কে চা নিয়ে এসেছেন।' একটা মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাস্ক টেবিলের ওপর রাখল কার্তিক, 'আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন। আমি কাপ নিয়ে আসছি।'

কার্তিকের পেছনে নেমে এল গগন। কিন্তু গোবর্ধনকে আশেপাশে দেখতে পেল না। এখন দিনের বেলায় গোবর্ধনের গুদামঘর ভাল করে নজর করল

সে। মাছ রাখার ঘর ছাড়াও ওপাশে দুটো টালির ঘর আছে। বাখারির বেড়া দিয়ে বাড়িটাকে আলাদা করা হয়েছে। টিউবয়েলের জলে হাতমুখ ধুয়ে ঘেরা জায়গায় ঢুকে শরীর হালকা করে আবার ওপরে উঠে এল গগন। জামাটা শরীরে চাপিয়ে ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুলে বোলাতেই গোবর্ধন কার্তিককে নিয়ে উঠে এল ওপরে, 'কী, রাত্রে ঘুম হয়েছে তো?'

'অসুবিধে হয়নি।'

'কার্তিক, চা ঢেলে দাও।' গোবর্ধন হুকুম করল।

দুটো কাপে চা ঢেলে কার্তিক নীচে চলে গেলে গগন বলল, 'তোমার এখানে বন্দোবস্ত ভালই, শুধু কাছাকাছি দোকানপাট নেই বলে যা সমস্যা।'

'লোকালয়ের মধ্যে মাছের গুদাম তো করা যায় না।' চায়ে চুমুক দিল গোবর্ধন, 'তবে কার্তিককে বললে ও এনে দেবে।'

'কাল রাত্রে পুলিশ এসেছিল।'

'হ্যাঁ। তোমাদের বাড়ি খুঁজে দেখেছে। চলে না আসলে বোকামি করতে।'

চা শেষ করে গগন বলল, 'তা হলে এখন আমি চলি? তোমার কি দেরি হবে।'

'না না। আমি এখনই ফিরব। কিন্তু তুমি এখানেই থাকো।'

'কেন? দিনের বেলায় তো কোনও ভয় নেই।'

'আছে। আজ পুলিশ আবার গাঁয়ে আসবে।' গোবর্ধন বলল।

'আমার খোঁজে?'

'আজ ভোরবেলায় খালের ধারে যদুনাথদাকে আধমরা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। জ্ঞান নেই। পুলিশ ওকে ভক্তহাটের হাসপাতালে ভর্তি করেছে।' গোবর্ধন জানাল।

'সে কী? যদুনাথকাকাকে কে মারল?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল গগন।

'কেউ জানে না, কোনও সাক্ষী নেই।'

'ঘটনাটা ঘটল কোথায়? ভোরবেলায় উনি কেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

'সেটাই কেউ বুঝতে পারছে না। তবে গুজব ছড়িয়েছে যে উনি থানায় যাচ্ছিলেন। খালের ওপর বাঁশের পুল পার হলে শর্টকাটে থানায় যাওয়া যায়। পুল আর পার হতে পারেননি।'

'অত সকালে থানায় যাওয়ার কী দরকার হয়েছিল?'

আমারবই.কম

গোবর্ধন হাসল, 'তোমাকে কাল সন্ধের পরেও শিবচরণপুরে দেখা গেছে এই খবরটা পুলিশকে জানাতে চেয়েছিলেন। এটাই গুজব। মদন নাকি কাউকে কাউকে এ সব কথা বলেছে। এই অবস্থায় তোমার এখনই শিবচরণপুরে যাওয়া ঠিক নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। কার্তিকের হাতের রান্না খারাপ, খেতে পারবে না। কুসুমকে বলেছি দু'বেলা রান্না করে দিতে।'

'কুসুম?' অবাক হল গগন।

'কার্তিকের মেয়ে। স্বামী মাতাল, বেকার বলে বাপের কাছে চলে এসেছে।'

গগনের মনে পড়ে গেল। কাল রাত্রে যে চিৎকার শুনেছিল সেটা তা হলে কুসুমের? কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে চাইল না সে। জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বলো তো, যদুকাকাকে কারা মেরেছে?'

'আমি জানি না। ভোরবেলায় চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেলে জানতে পারলাম। আজ পার্টির ছেলেরা বন্‌ধ ডেকেছে বিজুরি আর শিবচরণপুরে। ক'দিন পঞ্চায়েতের কাউকে দ্যাখা যায়নি, আজ তারাও বেরিয়ে এসেছে প্রতিবাদ করতে।' গোবর্ধন উঠে দাঁড়াল, 'কাল আমাকে আলতায় যেতে হবে। তোমার ব্যাপারে যতীনের সঙ্গে আজ কথা বলে নেব।'

'দূর। এই ভাবে চুপচাপ থাকা যায়?'

'কী আর করবে বলো।'

'তার মানে পুলিশের কাছেও গুজব পৌঁছাতে পারে। সেটা শুনে যদি তারা রতনের বুথে তদন্ত করতে আসে তা হলে জেনে যাবে আমি বর্ধমানে যাইনি।'

'তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, চেষ্টা করো ঘরের মধ্যে থাকতে। যদিও বাইরে বাখারির বেড়া আছে, এদিকে লোকজনও আসে না, তবু সতর্ক থাকাই ভাল। চলি।' গোবর্ধন নেমে গেল।

মাথায় কিছুই ঢুকছিল না গগনের। শিবচরণপুরের কেউ যদুকাকাকে মারতে পারে না। মারলে বাইরের লোক মেরেছে। বিজুরির কেউ কাজটা করবে না। যদুকাকা আর তারা একই পার্টির সমর্থক। হঠাৎ খেয়াল হল গগনের, যদুকাকা ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যাবেন এই খবরটা কি যারা মেরেছে তাদের জানা ছিল? না জানা থাকলে ওই সময়ে তারা কেন খালের ধারে অপেক্ষা করে থাকবে? এখন মনে হচ্ছে যদুকাকা থানায় গিয়ে

কালকে সন্ধের পরেও গগন গ্রামে ছিল এই কথাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেটা জানার পর ওঁকে আটকাতে খালের পাশে আক্রমণকারীরা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তারা যদুকাকাকে মেরে ফেলেনি কেন? জ্ঞান ফিরে এলে যদুকাকা তো পুলিশকে তাদের নাম বলে দেবেই। এই ঝুঁকিটা তারা কেন নিল? নাকি ওরা যদুকাকাকে ভুল করে মৃত ভেবে নিয়েছিল!

সেই সঙ্গে আর একটা কথা ভাবল গগন। যদুকাকার সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা ছিল না। সে শুধু মাড়োয়ারিকে জমি বিক্রি করতে রাজি হয়নি। যদুকাকা তার বাবার বন্ধু, মা'কে বহু দিন ধরে চেনেন। সেই যদুকাকা পুলিশের কাছে চুকলি কাটতে যাচ্ছিলেন যাতে সে ফেঁসে যায়? মানুষটা এত নীচে নেমে গিয়েছিল!

কার্তিক ওপরে উঠে এল। হাতে এক বাটি মুড়ি, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। টেবিলে বাটি রেখে বলল, 'আপনার কি চায়ের নেশা আছে?'

'কেন?'

'এখানে তো চা বানানো হয় না। আপনি খেলে চা-পাতা চিনি দুধ কিনে আনতে হবে। আমি একটু পরে হাটে যাব।' কার্তিক বলল।

'হাট? এখানে হাট বসে নাকি?'

'এখানে নয়। এক মাইল দূরে বুড়োশিবতলায় ছোটমতো হাট বসে। সপ্তাহে একদিন। সাইকেলে যাব আসব।' কার্তিক চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল, 'মাছ পেলে নিয়ে আসব। না হলে ডিমের ঝোল খেতে হবে।'

'বেশ তো। টাকা নিয়ে যাও। কত দেব?'

'বড়বাবু সব ব্যবস্থা করে গেছেন। আপনাকে টাকা দিতে হবে না।' কার্তিক নেমে গেল।

কিছুক্ষণ শুয়ে বসে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠল গগন। না, এভাবে থাকা যায় না। যদি সে সুন্দরবনের গভীরে কোথাও চলে যেত, যেখান থেকে ইচ্ছে হলেও বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব তা হলে সেটা মেনে নিতে বাধ্য হত। কিন্তু এখান থেকে কিছুক্ষণ সাইকেল চালালে শিবচরণপুর কিন্তু সেখানে কী ঘটছে তা সে জানতে পারছে না। তা কি হয়? যদুকাকা বেঁচে আছে কি না, নাকি হাসপাতালে, পার্টি যে বন্‌ধ ডেকেছে তার কী প্রতিক্রিয়া, এসবের কিছুই সে জানতে পারছে না। পুলিশ তো চোরের মতো গাঁয়ে ঢুকবে না। তাদের আসার খবর পেলেই সে গা-ঢাকা দিতে পারবে।

আমারবই.কম

এটা যদি সম্ভব না হয় তা হলে কলকাতায় চলে গেলেই হয়। কেউ যদি ঠিকানা না দেয় তা হলে পুলিশ তাকে বাগবাজারের বাড়ি থেকে ধরবে কী করে? ঠিক আছে, বাগবাজারের বাড়ির ঠিকানা না হোক, বুথের নাম্বার রতনকে চাপ দিয়ে পুলিশ বের করে ফেলতে পারে কিন্তু কলুটোলায় আলতাফের ডেরার খবর কিছুতেই পুলিশ পাবে না। আলতাফের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের। মালিককে অফিসে পৌঁছে দিয়ে অন্যান্য ড্রাইভারদের সঙ্গে তাস না খেলে সে আলতাফের সঙ্গেই গল্প করে। ওই একই বিল্ডিং-এর অন্য কোম্পানির বড় সাহেবের গাড়ি চালায় আলতাফ। ছুটির দিনে কয়েকবার সে গিয়েছে ওর ডেরায়। দুটো ঘরে পাঁচজনে থাকে। সবাই ড্রাইভারি করে। আলতাফ তাকে বলেছে ওদের আরও একজন দরকার। ছয়জন হলে খরচ কম হয় কিন্তু উটকো লোক রাখতে চাইছে না। আলতাফকে বললেই রমাপ্রসাদদার বাড়ি ছেড়ে সে কলুটোলায় গিয়ে থাকতে পারে। শুধু মালিকের চাকরি ছেড়ে নতুন কাজ ধরতে হবে।

গগন ঠিক করল এটাই করবে। তবে তার জন্যে তাকে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাত্রের অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে ভক্তহাটে গিয়ে ক্ষুদিদার দোকানে সাইকেল জমা দিয়ে বাস ধরবে কলকাতার। ক্ষুদিদাকে বলে দেবে গোবর্ধনকে খবর দিতে, সাইকেল নিয়ে যাবে সে। অত রাত্রে ধর্মতলায় নেমে বাগবাজারে যেতেই হবে বিছানাপত্র ও অন্যান্য জিনিসের জন্যে। ভোরবেলায় পৌঁছে যাবে আলতাফের ওখানে। যদি ইতিমধ্যে খবর না পেয়ে যায় তা হলে রমাপ্রসাদদা কৈফিয়ত চাইবে। একটা কিছু অজুহাত বানাতে হবে তখন।

এই সব ভেবেটেবে বেশ স্বস্তি পেল গগন। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে সে দরজা খুলে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। কেউ কোথাও নেই, একটা কাকও ডাকছে না। কার্তিক বোধহয় হাটে চলে গেছে। সে বাড়ির পেছনে চলে এল। কোমর অবধি ঝুরো গাছের জঙ্গল শুরু হয়ে গিয়েছে এখান থেকে। গাছগুলো কাঁটায় ভর্তি এবং গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। নিশ্চয়ই কোথাও এদের মাঝখানে পথ করা আছে নইলে গোবর্ধনরা যাওয়া আসা করে কী করে। শিবচরণপুরের বেশির ভাগ লোক এদিকে আসে না। ওখানে জন্মে, বড় হয়েও সে কখনও এই জঙ্গল পেরিয়ে আলতা নদী দেখতে যায়নি। এই জায়গাগুলো নিষিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে তারা মেনে নিয়েছিল।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ হল এবং একটা পাথর ছিটকে চলে গেল পাশ দিয়ে। গগন চমকে মুখ ফেরাতেই হতভম্ব হয়ে গেল। একটা কালো সাপ মাজাভাঙা অবস্থাতেও ফণা তোলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। সাপটা তার থেকে হাত তিনেক দূরে কী করে এল কে জানে? কিন্তু ওটা যে পাথরের ঘায়ে ঘায়েল হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কী করবে বুঝে ওঠার আগেই ওপাশের ঘরদুটোর একটা থেকে মেয়েটি বেরিয়ে এল হন হন করে। তার হাতে লাঠি। নির্দয়ভাবে সাপটাকে মেরে ফেলে লাঠিতে তুলে ওপাশের জঙ্গলে ছুড়ে দিয়ে আবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। গগন বলল, 'তুমি কি কুসুম?'

'নামটা কে কানে দিয়েছে?' দাঁড়াল কুসুম কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল না।

'আমাকে গোবর্ধন বলেছে তুমি রান্না করে দেবে।'

'অ। আর কী বলেছে?'

'আর—আর কিছু বলেনি।'

'জানি। বলার হিম্মত থাকলে তো বলবে! মাথা খারাপ করে দিলে আমার!'

গগন অস্বস্তিতে পড়ল। বোঝাই যাচ্ছে গোবর্ধনের ওপর কোনও কারণে রাগ আছে কুসুমের। তাই প্রসঙ্গ ঘোরাতে বলল, 'তুমি না মারলে সাপটা নিশ্চয়ই কামড়াত আমাকে। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলে আমি কৃতজ্ঞ।'

'তুমি কি সাপের ওঝা?' পেছন ফিরেই জিজ্ঞাসা করল কুসুম।

'না। কেন?'

'এমনভাবে বাক্যি বলছ যেন সাপের কুষ্ঠি জান। ওটা কালনাগিনী। এক ফোঁটা বিষ নেই শুধু ফণার জোর আছে। কামড়ালে ঘা হত, সেই ঘা সারাতে পনের দিন লাগত।' কুসুম ঘরে ঢুকে গেল।

সাপটার চেহারা মনে করল গগন। কালনাগিনী তো লখিন্দরকে কামড়েছিল। লখিন্দর মারা গিয়েছিল বলে বেহুলা তাকে ভেলায় নিয়ে ভেসেছিল। আর কুসুম বলল কালনাগিনীর বিষ নেই! বিষ থাকুক বা না থাকুক সাপের কামড় খেতে নিশ্চয়ই ভাল লাগত না। কুসুম তাকে সেটুকু থেকে তো বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার মানে এই যে সে এখানে যখন এসেছিল তখন কুসুম আড়ালে থেকে তাকে লক্ষ করছিল। কিন্তু মেয়েটার কথা বলার ধরন কী রকম কাঠকাঠ। ওই মেয়ে কাল রাত্রে কেন কেঁদেছিল, কেন ওর বাবা ওকে ধমক দিয়েছিল?

আমারবই.কম

এখন কুসুমের কথা শুনে মনে হচ্ছে এর পেছনে গোবর্ধন থাকতে পারে। গোবর্ধনের হিম্মত নেই, সে ওর মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, এসব কথার মানে হল ওর জীবনে গোবর্ধনের ভূমিকা আছে। কিন্তু গোবর্ধন বিবাহিত, বাচ্চা আছে, একেবারে সংসারী মানুষ। ব্যবসা করে দু' পয়সা কামাচ্ছে। গ্রামের যে কোনও অনুষ্ঠানে ভাল চাঁদা দেয়, তার সম্পর্কে কুসুম যা বলল তা গ্রামের কেউ বলবে না।

বাড়ির চৌহদ্দিটা ঘুরে দেখল গগন। এখানে সাপ থাকাই স্বাভাবিক। ওই দিগন্তবিস্তৃত বুনো ঝোপের জঙ্গলে শুধু সাপ কেন অনেক কিছু থাকতে পারে। কিন্তু সাপকে খুব ভয় করে তার। কাল রাত্রে যদি জানত তা হলে ঘুমাতে পারত না। জানলাটা খোলা রেখেছিল, সেটা দিয়েও সাপ ঢুকতে পারত। দিনের বেলায় যদি সাপ তেড়ে আসতে পারে রাত্রে তো কথাই নেই। অবশ্য সে যখন আজ সন্ধেবেলায় এখান থেকে চলে যাবে তখন সাপ নিয়ে না ভাবলেও চলবে।

'এই যে!' গলাটা ভেসে আসতে গগন ফিরে দেখল কুসুম তার ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা কাপ।

'মুখে রুচবে কিনা জানি না, ঘরের কৌটোয় তলানি যা পড়েছিল তাই ভিজিয়ে চিনি মিশিয়েছি। দুধ নেই তাই দেওয়া গেল না।' কুসুম বলল।

'কী দরকার ছিল?'

'তা হলে ফেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।' বারান্দায় কাপ নামিয়ে একটু সরে দাঁড়াল কুসুম। অগত্যা এগিয়ে গিয়ে কাপ তুলে চুমুক দিল গগন। সস্তা চায়ের গন্ধ নাকে লাগলেও বলল, 'ঠিক আছে।'

'কী করে যে ঠিক থাকে! মন ভেজানো কথাবার্তা।' কুসুম বলল।

'বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যে বলছি না।' গগন বলল।

'বয়ে গেছে বিশ্বাস করতে। যাকগে, আমার ওপর হুকুম হয়েছে মুখ বন্ধ করে থাকতে। দয়া করে কথাটা মনে রাখলেই খুশি হব। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে টঙের ঘরে ঢুকে আমাকে ধন্য করলেই আমি খুশি।' কুসুম বলল।

এই মেয়ে মেয়ে নয়, জ্যান্ত করাত। ওপরের ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে গগন ভাবল। এমন জিভ যার তাকে তো শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতেই হবে। কিন্তু কুসুম দেখতে ভাল। গ্রামের মেয়ের এমন চমৎকার ফিগার দেখা যায় না সচরাচর। শুধু ওই রকম কথা বলে তাই বিতাড়িত

হয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে? তা হলে ওর গোবর্ধনের ওপর অত রাগ কেন হবে? গগন হাসল, এসব সে কেন ভাবছে? কুসুমকে নিয়ে যা ভাবার তা গোবর্ধন ভাবুক।

একটু পরে কার্তিক এল ঘরে, 'মুশকিল হয়ে গেল।'

'কেন?'

'আজ হাট বসেনি। কোনও দোকানও খোলা নেই।'

'কারণটা কী?'

'হরতাল ডেকেছে পার্টি। যতীনবাবুর দল বাধা দিয়েছিল। দোকান খুলতে বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মারপিট হয়েছে। টেলিফোন বুথের রতনকে এমন মেরেছে যে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। তারপর পুলিশ আসে গ্রামে। অনেককে ধরেছে। তারা সবাই যতীনবাবুর দলের লোক। এসব শুনতে পেলাম।'

'যতীনকে ধরেছে?'

'তা তো জানি না। আমি অনেক খুঁজে কয়েকটা ডিম আনতে পেরেছি। বড়বাবুকে খবর পাঠিয়েছি যে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তোমরা কী খেয়ে থাকতে?'

'আমরা? আমাদের আর খাওয়া! গরম ভাত আলু সেদ্ধ আর লঙ্কা হলেই পেট ভরে যায়।' কার্তিক নেমে গেল নীচে।

পুলিশ যাদের ধরেছিল তাদের দুপুরের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিল। বেন্ধেমারি, শিবচরণপুরের মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে থানায় রাখলে খেতে দিতে হয়। থানায় অত জায়গাও নেই। ভাল করে ধমক দিয়ে পুলিশ হাত ঝেড়ে ফেলল। কিন্তু বিকেলের আগেই খবরটা চলে এল। না যদুনাথ নয়, টেলিফোন বুথের রতন মারা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চারধারে উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল। যতীনরা বড় মিছিল বের করল। সেই মিছিলের ক্রোধ দেখে পার্টির যেসব ছেলে বন্‌ধ দেখার জন্যে শিবচরণপুরে ছিল তারা বিজুরিতে পালিয়ে গেল। যেখানে পার্টির লোক দেখা যাচ্ছে সেখানেই জনতা ছুটে গেল মারধর করতে। গ্রামের পাঁচটি বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

বিকেল চারটের সময় টি ভি-তে ঘোষণা করা হল, আগামিকাল সরকারি অফিসাররা গ্রামগুলোতে আসবে জমির সমীক্ষা করতে। তাদের দেওয়া

আমারবই.কম

রিপোর্ট অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে।

এই খবরে আগুনে ঘি পড়ল। জমি রক্ষা কমিটি ঘোষণা করল, 'যে কোনও উপায়ে এই সমীক্ষা করা বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে রক্ত দেব কিন্তু জমি দেব না। শহিদ রতনের নামে শপথ করা হল।' এতক্ষণ যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিল তারাও এখন বেরিয়ে এল। শিবচরণপুর, বেন্ধেমারিতে মানুষ গলা খুলল, 'রক্ত দেব কিন্তু জমি দেব না।'

এই রকম উত্তেজনার আনন্দ কখনও পায়নি মানুষগুলো। পুলিশ নেই, পার্টির ছেলেদের চোখ রাঙানি নেই, দলবেঁধে রাস্তায় ঘুরে চিৎকার করে যাও, 'রক্ত দেব কিন্তু জমি দেব না।' যে কোনও দিন শ্লোগান দেওয়া দূরের কথা মিছিলেও হাঁটেনি, তারও বেশ মজা লাগছিল চিৎকার করতে। সন্ধের মুখে রতনের শরীর নিয়ে আসা হল হাসপাতাল থেকে। একটা ভ্যান রিকশায় রতনকে সাদা কাপড়ে মুড়ে কয়েকজন নিয়ে এল। স্কুলের মাঠে তাকে আনামাত্র ওর মা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলের শরীরের ওপরে। তখন সব শ্লোগান থেমে গেছে, শিবচরণপুরের মানুষ স্তব্ধ হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে তোড়া বাঁধা ফুল যতীন রাখল রতনের পায়ের কাছে। গ্রামের মানুষ লাইন দিয়ে রতনের মৃত শরীরকে নমস্কার করে যাচ্ছিল একের পর এক, যতীনের অনুরোধে। সেই লাইনে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান সুবল রায়ও হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। রতনের শরীরের কাছাকাছি আসতেই গৌরাঙ্গ চিৎকার করে উঠল, 'না না আপনি না, সুবলদা আপনি লাইন থেকে বেরিয়ে আসুন।'

সুবল রায় হকচকিয়ে গেলেন। জনতা তাঁর দিকে তাকাল।

গৌরাঙ্গ বলল, 'আপনার পার্টির লোক রতনকে মেরেছে। এই গ্রামের সবাই জানে ও কোনও রাজনীতি করে না, নিরীহ ছেলে তবু তাকে মারতে আপনাদের হাত একটুও কাঁপেনি। সেই হাতদুটো দিয়ে এখন রতনকে নমস্কার জানাতে এসেছেন?'

সুবল রায় বললেন, 'তুমি ভুল করছ বাবা। রতনকে কে মেরেছে তা আমি জানি না। যেই মারুক আমি তার শাস্তি চাই।'

'দু নম্বরি কথা। শালা পার্টির নেতা, ওকেই কবর দেওয়া দরকার।' কেউ একজন ভিড়ের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন। টেনে হিঁচড়ে বৃদ্ধকে বের করে আনল লাইন থেকে। চড় চাপড় পড়তে লাগল। যতীন দৌড়ে গেল, 'কী হচ্ছে কী? এখন শোকের সময়। রতনের শরীর এখনও আমাদের মধ্যে আছে। থামো তোমরা।'

দু' হাতে মাথা ঢেকে সুবল রায় মাটিতে বসে থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে যতীন বলল, 'আপনি বাড়ি চলে যান কাকাবাবু।'

সুবল রায় কথা বললেন না। ক'দিন আগেও যে মানুষটার কথাই এই গ্রামের শেষ কথা ছিল সেই মানুষ যেন দুমড়ে ছোট হয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কেউ ফিরেও দেখল না।

সন্ধের মুখে মিছিল করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল রতনের শরীর। কিন্তু যতীন, গৌরাঙ্গরা ওদের সঙ্গে গেল না। শিবচরণপুরের বাতাসে তখন একটাই ধ্বনি। 'শহিদ রতন তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না।'

সেই একই সময়ে জমি রক্ষা কমিটির মিটিং শুরু হল। দলের বিধায়ক থেকে কয়েকজন বড় নেতা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বললেন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল কিছুতেই জমি জরিপ করতে দেওয়া হবে না। সরকারি অফিসাররা যদি পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রামে ঢুকতে চায় তা হলে তাদের বাধা দিতে হবে। গ্রামে ঢোকার প্রতিটি রাস্তায় মানুষ বসে যাবে যাতে ওদের গাড়ি না ঢুকতে পারে। যদি পার্টির লোকেরা মারপিট করতে চায় তাহলে তার মোকাবিলা করার জন্যে এখন থেকে তৈরি হতে হবে। জমি বাঁচানোর এই আন্দোলনকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতেই হবে। গৌরাঙ্গ প্রস্তাব দিল, 'যদি সবাই গিয়ে রাস্তায় না বসে? তার চেয়ে যদি রাতারাতি আমরা রাস্তাগুলো কেটে ফেলি তা হলে কোনও গাড়ি ঢুকতে পারবে না।'

আমারবই.কম

দুপুরে ডিমের ঝোলের সঙ্গে ভাত খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছিল গগন। মেয়েটার জিভে যত ধারই হোক রান্নার হাত চমৎকার। এত ভাল আলুডিমের ঝোল সে কখনও খায়নি। কার্তিক তাকে খাওয়ার জন্যে নীচে যেতে দেয়নি, ওপরেই দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়ার পরে লম্বা ঘুমাবার পরে গগন দেখল সন্ধে হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ব্যাগ কাঁধে নীচে নামল সে। কুসুমদের ঘরে হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। সাইকেলটা গুদামঘর থেকে বের করা দরকার। সে ডাকল, 'কার্তিক!'

তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল কুসুম, 'কার্তিক নেই।'

হেসে ফেলল গগন। বাবার নাম ধরে জবাব দিতে মেয়েটার কোনও সংকোচ নেই? সে বলল, 'গুদামের দরজা খুলে দিতে হবে। সাইকেল নেব।'

'সাইকেল নেই।' নির্বিকার মুখে বলল কুসুম।

'নেই মানে?'

'বাবা নিয়ে গেছে।'

'কোথায় গেছে? আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। কখন আসবে বলেছে?' বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল গগন।

'আমাকে কি কেউ মানুষ ভাবে যে সব কথা বলে যাবে?'

'মহা মুশকিলে পড়লাম। এখান থেকে বাসস্ট্যান্ড হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে।'

'এসব শুনে আমি কী করব! যে লোকটা একটু আগে এসে বাবাকে খবর দিল সে শোনাল খুব গোলমাল হচ্ছে গ্রামে। বড়বাবু খবর দিতে বলেছে, বাবা যেন এখনই গিয়ে দেখা করে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, বাবা দৌড়াল।' কুসুম বলল।

'তা হলে আমি হেঁটেই যাচ্ছি।' পা বাড়াল গগন।

'যে মানুষের কোনও দাম নেই তার কথায় কে কান দেবে। তবু বলতে হয় বলে বলছি, গোলমাল যখন হচ্ছে তখন সেখানে হেঁটে যাওয়া কি ঠিক হবে? যে কারণে এখানে এসে থাকা হল তার কোনও মূল্যই হয়তো থাকবে না।' কুসুম বলল।

চিন্তায় পড়ল গগন। কী ধরনের গোলমাল ওদিকে হচ্ছে তা সে জানে না। হেঁটে গেলে তাকে শিবচরণপুরকে এড়িয়ে যেতে হবে। তাতে রাস্তা আরও বেড়ে যাবে। ভক্তহাটে পৌঁছে বাস পাবে কিনা সন্দেহ। গোলমাল যদি ভক্তহাটেও ছড়িয়ে থাকে তা হলে সে সোজাসুজি পুলিশের খপ্পরে পড়ে যাবে। তার চেয়ে কার্তিক ফিরে আসুক, ভোরের অন্ধকার থাকতে সাইকেলে বেরিয়ে গিয়ে ফার্স্ট বাস ধরলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ব্যাগটাকে সিঁড়ির ওপর নামিয়ে রেখে গগন বলল, 'ঠিক আছে। উপদেশটা মেনে নিলাম। আজ রাত্রে এখানেই থাকছি। তবে আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। খুব একটা খিদে নেই। রাত্রে না খেলেও চলবে।'

'আমি কি গুরুদেব যে উপদেশ দেব! আর এখানে চোর তো কেউ

নেই যে তার ওপর রাগ করে পেটে খিল দিয়ে থাকতে হবে। বাবাকে বলে দিয়েছি, মাছ না পাও, দোকান যদি খোলা না থাকে তা হলে বড়বাবুর বাড়ি থেকে কিছু তরিতরকারি চেয়ে নিয়ে এসো। আনলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' কুসুম বলল।

হঠাৎ প্রশ্নটা করে বসল গগন। 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। কাল রাত্রে ওইভাবে কাঁদছিলে কেন?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সজোরে হেসে উঠল কুসুম। 'ওম্মাঃ কাঁদলেও কৈফিয়ত দিতে হবে? কাঁদলে আমার খুব ভাল লাগে তাই কেঁদেছিলাম। হল?'

গগন আর কথা না বাড়িয়ে গুদামের সামনের দিকে চলে এল। পাতলা আঁধার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। সেদিকে তকিয়ে খুব খারাপ লাগল তার। গ্রামে কী হচ্ছে কিছুই জানতে পারছে না সে। যদুকাকা বেঁচে না গেলে ঝরনার কী হবে? মা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় আছে। যদি গোবর্ধন মাকে তার খবর দিয়ে থাকে তা হলে চিন্তাটা একটু কমবে। পার্টির সঙ্গে বিরোধী দলের ঝামেলা লাগলে বিরোধীদের হার অনিবার্য। তিরিশ বছর ধরে এই সব অঞ্চলে পার্টিই শেষ কথা। যতীনরা কীসের ভরসায় আন্দোলন করছে কে জানে!

গগন অলসভাবে হেঁটে বাড়ির পেছনে চলে এল।

সামনেই বুনো ঝোপ আর কাঁটার জঙ্গল। তার পর শুরু হয়ে গেছে গরান, সুন্দরী গাছের ঘন জঙ্গল। সেসব পেরিয়ে আলতা নদী। আজ অবধি ওসব অঞ্চলে সে কখনও যায়নি। গোবর্ধনরা যায়। রাস্তা চেনে বলে ওদের অসুবিধে হয় না।

সাইকেলের শব্দ শুনে বাড়ির দিকে আসতেই কার্তিকের গলা শুনতে পেল সে, 'একী? আপনি অন্ধকারে ওদিকে কী করছেন?'

'ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই—!' গগন বলল।

'কপাল ভাল আপনার তাই সাপের ছোবল খাননি। আমরা ঘরের সামনে অ্যাসিড রাখি বলে সাপ এদিকে আসে না। কালনাগিনী একবার কামড়ালে—!'

'কালনাগিনীর নাকি বিষ নেই!' গগন বলল।

'কে বলেছে আপনাকে? যে বলেছে তাকে কামড়ালে তবে টের পাবে!

আমারবই.কম

চলে আসুন এদিকে।' শেষের কথাগুলো প্রায় ধমকের সুরে।

গগনের রাগ হল, 'তুমি একটু ভদ্রভাবে কথা বললে খুশি হব।'

'না, মানে, আমি আপনার ভাল চেয়ে—।' থেমে গেল কার্তিক।

'যাক গে, গোবর্ধন কী বলল?'

'বড়বাবু খাবার, চা-বিস্কুট পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফ্ল্যাস্কটা ফেরত দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওতে আবার চা ভরে দিয়েছেন।'

'ওখানকার অবস্থা কী?'

'খুব খারাপ। রতনের বডি মিছিল করে সবাই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়েছে। আপনাদের গ্রামে এখন পার্টির কোনও লোকজন নেই। ছেলেরা সবাই বিজুরিতে পালিয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রধানও সেখান গেছে। শুনলাম ভক্তহাট আর বেন্ধেমারিতে খুব মারপিট হয়েছে। বিজুরিতে এখন সব পার্টির লোক।'

'পুলিশ?'

'একটাও পুলিশ দেখলাম না। বড়বাবু আপনাকে আরও কয়েক দিন এখানে থাকতে বললেন, উনি কাল সকালে আসবেন।' কার্তিক মালপত্র নিয়ে ভেতরে চলে গেল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল গগন। এসে মোম জ্বালল।

ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। শিবচরণপুর গ্রামে পার্টি অনেক বেশি শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে বিজুরিতে? তা হলে কি জমিরক্ষা কমিটির শক্তি বেড়ে গিয়েছে? কী করে বাড়ল?

কার্তিক এল চা বিস্কুট নিয়ে। ফ্ল্যাস্কে থাকায় এখনও গরম রয়েছে চা। গগন বলল, 'তোমরা বাকিটা নিয়ে নাও।'

'আমি চা খাই না।' কার্তিক মাথা নাড়ল।

'তোমার মেয়েকে দাও।' গগন বলল, 'দুপুরে খুব ভাল রান্না করেছিল।'

কার্তিক কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'বেশ, ওকে খেতে বলব।'

কার্তিক নেমে গেলে চা খেল গগন।

আধঘণ্টা যেতে না যেতে বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। কেউ যেন ডাকছে। তার পরেই কার্তিকের গলা শুনতে পেল গগন, সাড়া দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাদে কার্তিক উঠে এল ওপরে। 'বাবু আমাকে এখনই যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'বড়বাবু খবর পাঠিয়েছেন ট্রলারের মিস্ত্রিকে খবর দিতে। সে থাকে এখান থেকে দশ মাইল দূরে। কাল ভোরে তাকে দরকার। সন্ধের পর তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মালঝাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে কে জানে। যদি খুব রাত হয়ে যায় ভোররাতে ওকে সাইকেলে বসিয়ে ফিরতে হবে।'

'এত তাড়া কেন?'

'বড়বাবু ভোরেই আলতায় যাবেন। আপনি একটু দেখবেন—।'

'কী দেখার কথা বলছ?'

'কুসুম রইল। ও-ই রান্না করে দিচ্ছে। ওকে বলেছি ওপরে এসে খাবার দিয়ে যেতে। আমি যদি তার মধ্যে ফিরে আসি তা হলে তো হয়েই গেল।' কার্তিক চলে গেল।

গগন ভেবে পাচ্ছিল না গোবর্ধন এই সময় কেন আলতায় যাচ্ছে! এত গোলমালের মধ্যে তার মাছ ধরার কী দরকার হল? কিন্তু মাছ ধরতে যাচ্ছে, গুদামে বরফের ব্যবস্থা তো করেনি। ভক্তহাট থেকে রাশি রাশি বরফ লরিতে চাপিয়ে এখানে এনে রেখে ওরা মাছ ধরতে যায়। আজ অন্য রকম হচ্ছে কেন? নাকি ও বরফের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। ওরা এখানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে বরফ পাঠাবে কী করে?

আধঘণ্টা বাদে নীচ থেকে কুসুমের গলা ভেসে এল, 'রান্না হয়ে গেছে।'

গগন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, 'আমি কি নীচে যাব?'

'তা হলে তো মন্দ হয় না, আমার তো ওপরে ওঠা বারণ।'

'বারণ কেন?'

'তা তো জানি না। কালই বাবা নিষেধ করেছিল।' হাসল কুসুম, 'আজ সেই নিষেধ গিলে ফেলল। পরিস্থিতি বাধ্য করল। থাক, নামতে হবে না। আমি যাচ্ছি।'

একটু পরে থালা নিয়ে এল কুসুম। ভাত, ডাল, পটল ভাজা আর মাছের ঝোল। টেবিলে রাখতে গগন প্রশ্ন করল, 'তোমাদের আছে তো?'

'চার টুকরো মাছ এনেছিল। দু'টুকরো দিয়েছি। রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে বলে বাকি দুটোও রেঁধেছি। লাগলে দেব।'

'না। আমার লাগবে না। কার্তিকের জন্যে একটা রেখে বাকিটা তুমি খেয়ো।'

আমারবই.কম

'বাড়িতে বউ আছে নিশ্চয়ই।'

'না। কেন?'

'সংসারী মানুষেরা বউ-এর সঙ্গে এই ভাবে কথা বলে।'

'ও।'

'ভাত, ডাল বেশি আছে, লাগলে ডাকলেই এনে দেব।' কুসুম চলে গেল।

পেট ভরে গেল। আর একবার নামতে হল গগনকে, মেয়েটা ভাল রান্না করে। এমন কোনও ভাল মশলা নেই তবু কি উপাদেয় হয়েছে। এঁটো থালা গ্লাস নীচে নামিয়ে কলতলা থেকে মুখ-হাত ধুয়ে সে কুসুমের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি খেয়ে নাও, বাবার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।'

কুসুমের জবাব পাওয়া গেল না।

ঘরে ফিরে শোওয়ার তোড়জোড় করতে লাগল গগন। জানলার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে উঠল। একটাই শেয়াল কিন্তু কী রকম করুণ শোনাচ্ছে ডাকটা। গগনের মনে হল কুসুম নীচে একা আছে। ওর কী ভয় করছে না? ওর উচিত দরজা বন্ধ করে থাকা। সে জানলার বাইরে মুখ নিয়ে গেল, 'কুসুম, দরজা বন্ধ করে দাও। কার্তিক না ফিরলে রাত্রে খুলো না।'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কুসুম, 'ভয় নেই, বাঘ দূরের কথা, শেয়াল কুকুরেও মুখ দেবে না। দিলে তবু একটা হিল্লে হত।'

অন্ধকারে কুসুমকে দেখা যাচ্ছে না। ওদের ঘরটাও জানলা থেকে দেখা যাওয়ার কথা নয়। গগন চেঁচিয়ে বলল, 'আচ্ছা কুসুম, তুমি নিজেকে সব সময় ছোট কর কেন?'

'বারে! বড় নই বলে।' হাসল কুসুম, 'আপনি আমার কথা বেশি ভাবছেন। এটা ঠিক নয়। যান, ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুম আসছে না। আচ্ছা কুসুম, ওপাশের গ্রামগুলোতে যে কাণ্ড হচ্ছে তুমি তার খবর রাখো?' গগনের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।

কুসুম জবাব দিল না। গগন বুঝল কুসুম তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। সে জানলা থেকে সরে এল। এবং তখনই দূরে পর পর ভয়ংকর আওয়াজ হল। শক্ত হয়ে গেল গগন। এটা হয় গুলি নয়, বোমার শব্দ। কলকাতায় মাঝে মাঝে এমন শব্দ সে শুনেছে। শব্দ হওয়ামাত্র মানুষজন দুদ্দাড় করে পালায়।

কিন্তু তাদের এই অঞ্চলে আজ পর্যন্ত কখনও গুলি বা বোমার আওয়াজ হয়নি। পুলিশ কি গুলি চালাচ্ছে? কেন? কিন্তু পুলিশ তো বোমা ছোড়ে না। কারা ছুড়ছে? শিবচরণপুরের কারও কাছে বোমা থাকার কথা নয়। গোরা দলের পার্টি ওগুলো আনতে পারে। ওদের সেই ক্ষমতা আছে। তা হলে কি বিজুরির ছেলেরা বোমা নিয়ে আক্রমণ করেছে? করলে মহা অন্যায় করেছে। গগন ছটফট করতে লাগল। ওদিকে কী হচ্ছে তা তার পক্ষে জানতে যাওয়া বোকামি হবে। কিন্তু জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

আস্তে আস্তে আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। একেবারে নিঃশব্দ। কালও এত ভয়ংকর মনে হয়নি এই শব্দহীন চরাচরকে। গগন শুয়ে পড়ল দরজা বন্ধ করে। জ্বলতে জ্বলতে মোমবাতি অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। কিন্তু আজ ওটাকে নেভাতে তার ভয় করল। সে পাশ ফিরল।

রাত কতটা তা গগনের জানা নেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল আর্ত চিৎকারে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। মোমবাতির আলো দপদপ করছে বাতাসে। চিৎকারটা এখন কান্নায় নেমে গেছে। একান্ত প্রিয়জনের আচমকা মৃত্যু দেখলে মানুষের বুক থেকে এমন কান্না ছিটকে বের হয়। কয়েক সেকেন্ড পরে গগন বুঝল কুসুম কাঁদছে। তবে কি কার্তিক ফিরে এসেছে! কিন্তু গত রাতে কার্তিক ওর কান্না থামিয়েছিল ধমক দিয়ে। আজ সেই গলাটা পাওয়া যাচ্ছে না।

বিছানা থেকে নেমে জানলায় এল গগন। গোঙানির মতো কান্না এখনও চারপাশে ছড়াচ্ছে। মাথার ওপর তাকাতেই কুমড়োর সরু ফালির মতো চাঁদ দেখতে পেল সে। চাঁদটাকে কী করুণ দেখাচ্ছে।

দরজা খুলল গগন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। অন্ধকারে সামান্য আলোর ছোপ দিয়েছে ওই ফালি চাঁদ। তার পায়ের শব্দ পেয়ে উঠোন থেকে দৌড়ে চলে গেল কিছু প্রাণী। গগন থমকে গেল। ওরা কুকুর হতেই পারে না। তবে কি শেয়ালের দল চলে এসেছিল এখানে?

দরজা ভেজানো, ভেতর থেকে বন্ধ নয়। এক ফালি আলো বোধহয় আসছে মাঝখান থেকে। একটু ইতস্তত করে গগন দরজা ঠেলতেই দেখল তক্তাপোশের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কুসুম কেঁদেই চলেছে। ওর পিঠ উঠছে, নামছে।

'কুসুম।' নিচু গলায় ডাকল গগন।

আমারবই.কম

সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল পিঠ।

'কী হয়েছে কুসুম?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গে সঙ্গে ভেজা মুখ নিয়ে ঘুরে বসল কুসুম। 'কী হলে খুশি হন আপনি? আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেও সুখ হল না আপনার? আমাকে রাতের পর রাত ভোগ করেও তৃপ্তি পেলেন না আপনি? আবার এসেছেন মিষ্টি কথায় আমাকে ভোলাতে? আসল ধান্দা তো ওই একটাই। বাড়ির বউতে অরুচি হয়ে গিয়েছে, আমি পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা? বেশ তাই হোক। কিন্তু এবার আমি বাচ্চা চাই। জাতে মাতাল হলে তালে ঠিক রাখেন প্রতিবার। ওসব ব্যবহার করতে আজ আর দেব না। আসুন, আমাকে বাচ্চা দিন।'

ভয়ংকর হয়ে গেল কুসুমের মুখ। উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গে গগন দরজা ভেজিয়ে দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ঘরে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল। এসব কী কথা তাকে বলল কুসুম? গতকালের আগে সে তো ওকে চোখে দ্যাখেনি, নামও জানত না। তা হলে?

কুসুম তা হলে কাকে কথাগুলো বলছিল? না, তাকে অবশ্যই হতে পারে না। চট করে গোবর্ধনের মুখ মনে এল। গোবর্ধন বিবাহিত। তিনটি বাচ্চা আছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ওর বাবা বিয়ে দিয়েছিল। তা হলে কি গোবর্ধন কুসুমের সঙ্গে—। মাথা নাড়ল গগন। ছি ছি! কার্তিক নিশ্চয়ই সব জানে? জেনেও সহ্য করে আছে চাকরি যাওয়ার ভয়ে। বোঝাই যাচ্ছে রোজ গভীর রাত্রে কুসুমের মন বিদ্রোহ করে ওঠে। কাল কার্তিক মুখ চাপা দিয়েছিল যাতে গগন শুনতে না পায়। গগন ঠিক করলে কাল সে চলে যাবেই। এখানে থাকা আর সম্ভব নয়।

গগনের ঘুম ভাঙল মানুষের কথাবার্তা কানে যাওয়ায়। শব্দগুলো ভেসে আসছে ডান দিকের গুদাম ঘর থেকে। সে দেখল আকাশে আলো ফোটেনি কিন্তু তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। দরজাটা খুলে সে দেখল গুদামঘরে কয়েকজন মানুষ জিনিসপত্র নিয়ে কিছু করছে। গুদামঘরের দরজা খোলা।

'কীরে? উঠে পড়েছিস। আমি তোকে ডাকতে যাব ভাবছিলাম।' গোবর্ধন এগিয়ে এল, 'তুই নিশ্চয়ই কিছু শুনিসনি? কাল ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।'

'কী হয়েছে?' গলা অপরিষ্কার গগনের।

'পার্টির গুন্ডারা কাল আক্রমণ করেছিল। বন্দুক, বোমা নিয়ে। আমাদের দু'জনের পায়ে আঘাত লেগেছে। পুলিশ সব শুনেও আসেনি।'

'তারপর?'

'খালি হাতে তো গুলি বোমার সঙ্গে লড়াই করা যায় না। একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে। তুই কী করবি? গ্রামে যাবি? আমাদের সঙ্গে আলতায় গেলে নদী পেরিয়ে ওপাশ দিয়ে কলকাতায় চলে যেতে পারবি।'

'আমি গ্রামে যাব। এখনই।' বলে ব্যাগটা নিয়ে নীচে নেমে একটাও কথা না বলে গগন হাঁটতে লাগল।

গোবর্ধন পেছন থেকে চিৎকার করল, 'গগন, কী হয়েছে? হেঁটে যাচ্ছিস কেন? সাইকেলে যা। যা বাব্বা! ওর কী হয়েছে কার্তিক?'

কার্তিক বলল, 'আমি তো কিছুই জানি না বড়বাবু।'

যদুনাথ মারা যাননি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে। এখন অনেকটাই সুস্থ তিনি। হাসপাতালের সেবাযত্নে শরীর ফিরছে। তাঁর সেখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। জমিরক্ষা কমিটির সঙ্গে সংঘর্ষে আহত দুটি তরুণকে সেকথাই বোঝাচ্ছিলেন তিনি। লাঠির আঘাতে একজনের পা ভেঙেছে। প্ল্যাস্টার করা পা ঝুলিয়ে শুয়ে থাকে সে। দ্বিতীয়জনের কাঁধের হাড় সরে গেছে। কিন্তু পার্টির নির্দেশ, এখন গ্রামে ফেরা চলবে না। বেন্ধেখালির মতো শিবচরণপুর পার্টির হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সেখানে ফিরলেই জীবনসংশয় হবে। সরকারি হাসপাতালের তিনতলার ঘরগুলোকে আশ্রয় ক্যাম্প হিসেবে কিছু দিনের জন্যে ভাবতে হবে। গ্রামগুলোর দখল পার্টি নেওয়ার পর তিনি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারেন।

যদুনাথ ঝরনার কথাও ভাবেন। আইবুড়ো মেয়েটা একা বাড়িতে রয়েছে। একেই ওর বুদ্ধি কম তারপর স্বাস্থ্যটাও চোখে পড়ার মতো বেশি। ওর যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি। আহত হয়ে ভক্তহাটে যখন ছিলেন তখন ঝরনা তাকে দু'দিন দেখতে এসেছিল।

দ্বিতীয় দিনে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি পুলিশকে বলেছ গগনদা তোমাকে মেরেছে?'

'তাই তো মনে হল।' যদুনাথ চোখ বন্ধ করেছিলেন।

আমারবই.কম

'মনে হল? তুমি গগনদাকে চেনো না?' ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল ঝরনা।

'কী করে চিনব? সবাই তো কাপড়ে মুখ ঢেকে লুকিয়েছিল গাছের আড়ালে।'

'তা হলে তুমি কেন গগনদার নাম বলেছ?'

'আহা, কান তো খোলা ছিল। একটা গলা তো গগনের বলে মনে হল।'

'বাজে কথা। গগনদা সেখানে ছিলই না। আসলে ওর ওপর তোমার রাগ ছিল তাই এই সুযোগে ফাঁসাতে চাইলে। তুমি বাপ না কসাই?'

'আমি তোর বাপ, গগনের তো নয়।'

'আজ বাদে কাল তো হওয়ার কথা। শ্বশুর তো বাপের মতো।'

'ও নিয়ে তুই ভাবিস না ঝরনা। একটা ড্রাইভার ক'টাকা মাইনে পায়? নুন আনতে পান্তা ফুরোবে। তোর বিয়ে আমি অন্য জায়গায় দেব। আমাদের পার্টির এক নেতা রাজারামের বিশাল সম্পত্তি, প্রচুর টাকা, আজ সকালে আমাকে দেখতে এসেছিল। বেশি বয়স নয়। বাচ্চা হতে গিয়ে বউবাচ্চা দুটোই মরে গিয়েছে। আমাকে যদুদা না বলে কাকাবাবু বলল। শোনামাত্র মনটা ভরে গেল আমার।' যদুনাথ বলেছিলেন।

'তোমার মনের মুখে আগুন।' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল ঝরনা।

বাড়িতে কাঁচা টাকা বেশি নেই। বিভিন্ন পোস্ট অফিস এবং ব্যাঙ্কগুলোতে ছড়িয়ে রেখেছেন যদুনাথ। কিন্তু সোনা আছে। ঝরনার মায়ের মৃত্যুর পরে হাতে টাকা এলেই সোনা কিনেছেন তিনি। সেগুলো টিনের সুটকেসে ভরে বাড়ির ভেতর পুঁতে রেখেছেন তিনি। কেউ জানে না কোথায় ওগুলো পোঁতা আছে, পাশ বইগুলো নিয়ে চিন্তা হল এখন। ওগুলো আলমারির লকারেই পড়ে আছে। থাক পড়ে। পাশবই দেখিয়ে তো কেউ টাকা তুলতে পারবে না। গ্রামটা বেদখল হয়ে গেল। যতীন ফায়দা লুটল। আবার দখলে এলেই পাশ বইগুলোর একটা হিল্লে করতে হবে।

অত কাকভোরে ভেতর দরজায় শব্দ হচ্ছে শুনে বন্যা উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু মা তাকে বাধা দিল, 'তুমি যেয়ো না। আমি দেখছি।'

দরজা খুলে মা চমকে উঠল, 'তুই? তাড়াতাড়ি ভেতরে আয়।'

'কেন?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'কেউ যদি দেখে ফ্যালে!'

'এখনও সেই ভয় আছে?'

'কিছু বলা যায় না। চুকলি কাটার লোকের তো অভাব নেই। আয়।'

নিজের ঘরে ঢুকল গগন। এতটা রাস্তা হেঁটে এসে বিছানা দেখতে পেয়ে ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়তে। বিছানায় বসতেই ইচ্ছেটা বেড়ে গেল। শুয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম যেন জলের মতন তাকে গিলে ফেলল। নিরাপদ ঘুম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা হয়ে গেছে। কলঘর থেকে মুখ ধুয়ে আসতেই বন্যা চা আর বিস্কুট এগিয়ে দিল সামনে।

গগন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সেই থেকে আটকে আছেন?'

'ঠিক আটকে নেই। যতীনবাবুরা যা চাইছেন তা গ্রামের মেয়েদের বুঝিয়ে বলছি।' বন্যা বলল, 'আপনার কেমন কাটল?'

'মোটামুটি। আমার এক পরিচিতর মাছের গুদামের ওপরে ছিলাম। প্রায় বন্দির মতন। কোনও খবর পাইনি। তবে গুলিবোমার আওয়াজ পেয়েছিলাম।' গগন বলল।

'হ্যাঁ। বিজুরির লোক বোমাগুলি চালিয়েছে। দু'জন আহত হয়েছিল। তাদের যখন ভক্তহাটের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন প্রথমে ভর্তি করতে চায়নি। পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করার পর চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে। আজ রাত্রে আরও বেশি আক্রমণ হবে বলে ভয় পাচ্ছে সবাই।' বন্যা বলল।

'পুলিশ ওদের আটকাচ্ছে না?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

মা ঢুকল ঘরে, 'পুলিশ তো চায় ওরা গ্রাম দখল করুক। জমিরক্ষা কমিটিকে শেষ করতে পারলে পার্টির লোকজন সরকারকে সব জমি অধিগ্রহণ করতে সাহায্য করবে। পুলিশ তাই পার্টিকে সাহায্য করবেই।'

গগন অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। এই ক'দিনেই মায়ের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। এখন বোধহয় মা যে কোনও জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারবে।

কিছুক্ষণ বাদে গগন যখন বেরুচ্ছে তখন বন্যা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে?'

'বিন্দুমাত্র নয়। মা, যাচ্ছি।' চিৎকার করল গগন।

'আয়। ভাইকে দেখলে পাঠিয়ে দিস তো!'

হাঁটতে হাঁটতে গগন বলল, 'আমাদের সেই শান্ত গ্রামটার যেন আচমকা

আমারবই.কম

পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পালটে গিয়েছে বাড়ির মানুষগুলোও।'

'যেমন?' বন্যা মুখ ফেরাল।

'যেমন আমার মা। কখনও রাজনীতি পছন্দ করত না; বললেই বলত ওসব কচকচিতে আমি নেই, সেই মা আপনার সৌজন্যে কত কথা বলছেন।'

'আমার সৌজন্যে নয়, ওঁর ভেতরে কথাগুলো জমে ছিল, এখন বেরিয়ে আসছে।'

'জানি না। যে ভাই বাড়ি থেকে বের হত না বোবা বলে সবাই খ্যাপায় বলে, তাকেও তো দেখা যাচ্ছে না বাড়িতে।'

যারা কাজেকর্মে যচ্ছিল তারা ঘুরে ঘুরে গগনকে দেখছিল। একজন তো জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'তুমি কবে এলে?'

'আজই।'

'সাবধান থেকো।' লোকটা বলে গেল।

বন্যা বলল, 'ওখানে আরও কয়েক দিন থাকা যেত না?'

'না।' গগন মাথা নাড়ল।

'এই যে বাবা গগন, চললে কোথায়?' ওপাশ থেকে এসে মদন সামনে দাঁড়াল।

'দরকার আছে।' গগন এড়াতে চাইল।

'তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে যেতে দেখেই বুঝেছি দরকারটা খুব জরুরি। কিন্তু এসব কী হচ্ছে বলো তো, সর্বনাশ হয়ে গেল আমার।' হাত কচলাল মদন।

গগন কোনও কথা বলল না।

'এই গাঁয়ে যাদের কাছে টাকা ছিল তারা সবাই পালিয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে, তোমরা নাকি দেখতে পেলেই তাদের মেরে ফেলবে। যারা রয়ে গেছে তাদের ভাঁড়ে মা ভবানী। এমন কেউ নেই যার কাছে দশটা টাকা ধার করতে পারি! কী অবস্থা!' মদন বলল।

'বিজুরিতে যান। তাদের সবাইকে পেয়ে যাবেন।'

'গিয়েছিলাম, ঢুকতে দিল না। বলল পার্টির খাতায় যাদের নাম আছে শুধু তাদের আশ্রয় দেওয়া হবে। কী যন্ত্রণার কথা। যাওয়া-আসাই সার হল। তা বাবা, তুমি তো বর্ধমানে চাকরির জন্যে গিয়েছিলে, পেয়েছ?'

বন্যা কথা বলল, 'আপনি কী করে জানলেন ইনি বর্ধমানে চাকরির জন্যে গিয়েছেন?'

'যাচ্চলে! তোমার গায়ে লাগল কেন মা? যাকগে, বাবা গগন, দশটা টাকা ধার দাও তো! মাসের এক তারিখেই শোধ করে দেব।' হাত পাতল মদন।

'আপনার ছেলে পবনকে দেব। ওর কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।'

মদনকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে লাগল গগন। বন্যা জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কে?'

'প্রত্যেকটা গ্রামে কিছু মানুষ থাকে যারা না থাকলেই গ্রামের মানুষের উপকার হত, ইনি তাদের একজন।' গগন জবাব দিল।

স্কুলের মাঠে নয়, যতীনকে পাওয়া গেল খালের পাশে খড়ের ছাউনির নীচে। সেখান থেকে অন্তত আধ মাইল চৌদিক দেখা যায়। যতীনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল যে ছেলেটি তার বয়স বেশি নয়। যেতে যেতে বলছিল, 'পুলিশ বা পার্টির লোক অ্যাটাক করতে এলে তাদের বহু দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। তাতে গা ঢাকা দিতে সুবিধে হবে বলে ওখানে মিটিং হচ্ছে। আমরা না নিয়ে এলে কেউ এখানে আসতে পারবে না।' গগন লক্ষ করেছিল সেটা। কিছু দূর অন্তর একটা ছেলে মাঠের মধ্যে অলসভঙ্গিতে বসে আছে। এরা নিশ্চয়ই পাহারায় রয়েছে।

ওদের দেখে কথা থেমে গেল। দশজন লোকের মধ্যে এম এল এ-ও আছেন। যতীন, বঙ্কিম, শিবচরণপুরের আরও কয়েকজন ছাড়া বেঙ্কেমারির লোকও রয়েছেন। যতীন জিজ্ঞাসা করল, 'তুই গোবর্ধনের সঙ্গে আলতায় গেলি না?'

'না। সম্ভব ছিল না।' গগন জবাব দিল।

যতীন এম এল এ এবং বাকিদের সঙ্গে বন্যার আলাপ করিয়ে দিল। বন্যা বলল, 'আমি জানি এই সময় বিরক্ত করছি। কিন্তু আমার যে একবার বাড়িতে যাওয়া দরকার। একবেলার জন্যে এসে বেশ কয়েক দিন থেকে যেতে হল।'

যতীন বলল, 'হ্যাঁ। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি থাকায় গ্রামের মেয়েরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। সমস্যা হল, আপনি ফিরবেন কী করে?'

'ভক্তহাটে পৌঁছে গেলে নিশ্চয়ই কিছু পেয়ে যাব।' বন্যা বলল।

'অন্য কেউ হলে অসুবিধে হত না কিন্তু এখন তো আপনার কথা ওরা জেনে গেছে। ভক্তহাটে পৌঁছতেই দেবে না ওরা।' যতীন মাথা নাড়ল।

আমারবই.কম

এম এল এ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, 'আমার গাড়ি দেখলেই ওরা হইহই করে তেড়ে আসছে। এখনও রাস্তা আটকায়নি অথবা গাড়িতে ঢিল ছোড়েনি। কিন্তু সেটা যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে। আমি আজ কলকাতায় যাব। আপনি আমার গাড়িতে যেতে পারেন। একটু ঝুঁকি নিতে হবে।'

বন্যা বলল, 'সেটা ঠিক আছে। আপনি কখন যাবেন?'

ঘড়ি দেখলেন এম এল এ, 'আধঘণ্টা পরে। আমার গাড়ি স্কুলের মাঠে আছে, ওখানে চলে আসুন।'

কেউ যেন দূরে চিৎকার করল, 'পুলিশের গাড়ি।' সেটা মুখে মুখে রিলে হয়ে চলে এল এদের কাছে। এম এল এ বিরক্ত হলেন, 'আবার পুলিশ কেন?'

যতীন দু'জনকে নিচু গলায় কিছু বলতে তারা গ্রামের দিকে দৌড়ে গেল। যতীন গগনকে বলল, 'বসো তোমরা। পুলিশের সামনে ওঁর যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

সবাই বসলেন, 'আমরা যে-কোনও মূল্যে জমি রক্ষা করবই। মাড়োয়ারিরা পার্টির লোকের মদতে লোভ দেখিয়ে যেসব জমি কিনেছে সেগুলো জমির আসল মালিককে ফেরত দিতে হবে। বিজুরি থেকে প্রতিনিয়ত আমাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। গোলাগুলির বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াই করা যায় না। এই কারণে আমাদের এখন টাকার দরকার। শিবচরণপুর এবং বেদ্ধেমারির সম্পন্ন মানুষদের কাছে আমরা আবেদন জানাব জমি রক্ষা কমিটির ফান্ডে অর্থ সাহায্য করতে।'

যতীন বলল, 'দাদা, আমার প্রস্তাব গ্রামের সমস্ত মানুষ, এমনকী ভক্তহাটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও মাসিক চাঁদা তোলা উচিত। এর ফলে সবাই জমি রক্ষা কমিটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারবে।'

'বেশ। তাই হোক। গৌরাঙ্গ এবং তুমি এই ফান্ডের দায়িত্ব নেবে। জনতার দেওয়া টাকার হিসেব যাতে ঠিকঠাক থাকে তা খেয়ালে রাখবে।' এম এল এ বললেন।

গ্রামের দিক থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছিল। যে দু'জন ছেলে যতীনের নির্দেশে দৌড়ে গিয়েছিল তাদের একজন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, 'মারছে, খুব মারছে, মেয়েছেলের গায়ে লাঠি মেরেছে।'

যতীনের চোয়াল শক্ত হল, 'পুলিশ?'

মাথা নাড়ল ছেলেটি, 'হ্যাঁ। সব সাদা পোশাকের। মনে হল ওই পুলিশের দলে পার্টির ছেলেও আছে।'

'মারছে কেন?'

'তোমাদের ধরিয়ে দিতে বলছিল। কোথায় তোমাদের পাওয়া যাবে জানতে চাইছিল। কেউ না বলায় লাঠিপেটা করছে।' ছেলেটি বলল।

যতীন এম এল এ-র দিকে তাকাল, 'দাদা, গ্রামে আর পুলিশকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। যেমন করে হোক এটা বন্ধ করতে হবে।'

এম এল এ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। আর পারা যাচ্ছে না।'

গগন এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

যতীন 'করো।'

'আমরা গ্রামের মানুষ এত দিন একসঙ্গে ছিলাম। শুধু ভোট দেওয়ার সময় আলাদা হতাম। জমি নিয়ে যখন ভাগাভাগি হল তখন দেখা গেল এত দিন যারা পার্টিকে সমর্থন করত তাদের অনেকেই শিল্পের জন্যে জমি ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছে না। জমি বাঁচানোর জন্যে তারাও জমি রক্ষা কমিটির পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছুক। যেমন আমি। জমি নিয়ে যত দিন সরকার তার নীতি না বদলাবে তত দিন আমি পার্টিকে সমর্থন করব না। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে হরনাথদাকে খুন করব। অথচ পুলিশ আমাকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করছে। আমি অবাক হয়ে শুনলাম বিজুরির পার্টির লোকজন পুলিশকে আমার নাম বলেছে। বিনা দোষে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এরপর পার্টির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা এখন কী করব? ওদের সঙ্গে লড়াই করার কথা আপনারা বলেছেন। তার জন্যে টাকার দরকার। টাকার ব্যবস্থা হলে আমরা কি অস্ত্র কিনব? সেসব কোথায় বিক্রি হয় আমরা কী জানি? যদি অস্ত্রের ব্যবস্থা হয় তা হলে সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও তো জানি না। আর যদি এ সবের ব্যবস্থা হয় তা হলে কী হবে তা আমি ভাবলেই শিউরে উঠছি। আমাদের এই এলাকার গ্রামগুলোতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। আমরা কি তাই চাইব?' গগন তাকাল যতীন এবং এম এল এ-র দিকে।

এম এল এ বললেন, 'খুব যুক্তিযুক্ত কথা। আমরা কেউ চাই না সংঘর্ষে

আমারবই.কম

জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু সরকার বা বেসরকারি সংস্থার হাতে আমাদের জমি তুলে দিতে অনিচ্ছুক। আমরা আপত্তি করছি বলে সরকারি পার্টি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ওরা সরকারকে সাহায্য করতে চাইবেই। তোমার কথায় যত যুক্তি থাক আমরা কি ওদের অন্যায় মুখ বুঝে সহ্য করব?'

গগন মাথা নাড়ল, 'না। প্রতিবাদ করবই। গণতান্ত্রিক উপায়ে তা করা উচিত।'

এম.এল.এ বললেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করব আর ওরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নিজেদের রক্ষা করব কী করে?'

বন্যা চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'কেউ ইট ছুড়লে তাকে পাটকেল খেতেই হবে।'

এই সময় দ্বিতীয় ছেলেটি ফিরে এসে জানাল, 'পুলিশ চলে গেছে। তিনজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে বলে ভ্যানে তুলেছে। বলেছে কাল সকালে সার্ভে টিম আসবে। কোনও গোলমাল বরদাস্ত করা হবে না।'

বন্যা এম এল এ-কে বলল, 'আমি কি বাড়িতে বলে আসতে পারি।'

যতীন অবাক হল, 'আপনি তো বাড়িতেই যাবেন বললেন।'

বন্যা হাসল, 'এখানে যাঁদের কাছে আছি...!'

এম এল এ বললেন, 'তা হলে চটপট স্কুলের মাঠে চলে আসুন।'

বন্যা গগনকে বলল, 'আপনি কি যাবেন?'

গগন উঠল। যতীনের দিকে মাথা নেড়ে বন্যার সঙ্গী হল।

ওরা চলে গেলে এম এল এ বলল, 'সমস্যায় পড়েছে এরাই। দু' দিন আগেও পার্টির সমর্থক ছিল। এখন জমির ইস্যুতে পার্টিকে মানতে পারছে না অথচ পার্টির বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় যেতেও দ্বিধা করছে। এদের সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। যে কোনও মুহূর্তে ওদের মন ঘুরে যেতে পারে।'

যতীন বলল, 'আমার বিশ্বাস গগন কখনওই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তা ছাড়া ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে। করেছে ওর আগের পার্টির লোক। সেটাও ও ভুলতে পারবে না।'

এম এল এ বললেন, 'একটু আগে আমরা যে আলোচনা করলাম সেই মতো কাজ শুরু করে দাও। আজ সারা দিন ধরে তোমরা তৈরি হও। সন্ধে হলেই কাজ শুরু করে দেবে। আমি পরশু ফিরে আসব।'

শিবচরণপুরে আজ গাড়ির ভিড়। প্রত্যেক গাড়িতে প্রেসের স্টিকার লাগানো। কাগজ ছাড়া টিভি চ্যানেলগুলোর ভ্যানও পৌঁছে গেছে। তারা সাধারণ মানুষকে ধরে ধরে জানতে চাইছে আজ কী হয়েছিল। পুরুষরা কথা বলতে ভয় পেলেও মেয়েরা কিন্তু সাহস করে মুখ খুলছে। তারা বর্ণনা দিচ্ছে কীভাবে পুলিশ ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়েছে। বেধড়ক লাঠি মেরেছে। নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গগন শুনতে পেল একজন তরুণ ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমরা এখন শিবচরণপুরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার মানুষ শিল্পের জন্যে জমি দিতে মোটেই আগ্রহী নন। জমি রক্ষা কমিটির লোকজনের সঙ্গে সরকারি পার্টির ছোটখাটো সংঘর্ষের পর বেন্ধেমারি এবং শিবচরণপুর থেকে পার্টির বেশির ভাগ সমর্থক অন্যত্র চলে গিয়েছে। তার ওপর আজ পুলিশ এসে এখানে নির্বিচারে লাঠি চালিয়েছে। লাঠির আঘাতে তিনজন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক কথায় গ্রাম এখন অগ্নিগর্ভ। শিবচরণপুর থেকে অর্ণব দত্ত ও রতিকান্ত ঘোষ। শিউলি।'

গগন ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। বন্যাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আট জন মহিলা। তাঁরা অনুরোধ করে চলেছেন যেন বন্যা এখনই না ফিরে যায়।

বন্যা মাথা নাড়ছেন, 'কত দিন হয়ে গেল। বাড়িতে চিন্তা করবে। ফোনের পথও বন্ধ।'

একজন মহিলা বললেন, 'এই কথা? এই টুলি, যা তো, তোর জামাইবাবুর কাছ থেকে মোবাইলটা চেয়ে নিয়ে আয়। বলবি আমি চাইছি।'

শোনামাত্র অল্পবয়সি মেয়েটি ছুটল। গগনকে দেখতে পেয়ে বন্যা বলল, 'দেখুন তো কী কাণ্ড! এঁরা আমাকে থেকে যেতে বলছেন।'

মা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'তুমি থাকলে মেয়েরা ভরসা পাবে। আমরা তো সবাই ঘরের বউ মেয়ে মা। এত দিন ছেলেরাই আমাদের ঘরের বাইরে আসতে দেয়নি। এখন যখন আসতে হচ্ছেই তখন তোমার মতো কেউ পথ দেখালে সুবিধে হয়। আমি বলি কী, ফোনে কথা বলে দেখো, ওঁদের অনুমতি পেলে না হয় ক'দিন থেকে যাও।'

বন্যা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী বলছেন?'

গগন বলল, 'এই বাড়িতে মায়ের কথাই শেষ কথা।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা খুশিতে হাততালি দিল।

আমারবই.কম

এই সময় মেয়েটি ফিরে এল মোবাইল ফোন নিয়ে। বন্যা সেটা নিয়ে নম্বর টিপল। প্রথমবারে সংযোগ হল না। দ্বিতীয়বারে হাসি ফুটল বন্যার মুখে, 'হ্যাঁ, আমি বলছি। না না ঠিক আছি। মাকে ডাক।' তারপর মুখ তুলে বলল, 'সবাই খুব—। হ্যাঁ মা, না না আমি ভাল আছি। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এখানে এখন কোনও ঝামেলা নেই। শুধু বাস বন্ধ বলে যেতে পারছি না। এই? এই গ্রামের নাম শিবচরণপুর। আচ্ছা, তুমি একটু কথা বলো। আমি যাঁর কাছে আছি তিনি তোমার মতন একজন মা।'

মোবাইল ফোনটা মায়ের দিকে এগিয়ে ধরল বন্যা। মা একটু ইতস্তত করে সেটা কানে চাপলেন, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। বন্যা আমার কাছে আছে। হ্যাঁ। ঠিক। আসলে গ্রামের সবাই চাইছে ও আরও কয়েক দিন এখানে থাকুক। বাস চললেই ওকে রওনা করিয়ে দেব। ঠিক আছে। বেশ।' মায়ের মুখে হাসি, 'আর কোনও চিন্তা নেই। উনি অনুমতি দিয়েছেন।'

সারা দিন বন্যা বাড়ির বাইরে। ছয়জনের একটা দল তৈরি করে সে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। মেয়েদের বোঝাচ্ছে, জমি বাঁচানোর লড়াই শুধু ছেলেদের একার নয়। মেয়েদেরও সমান অধিকার এবং দায়িত্ব আছে। পুলিশ গ্রামে এলেই দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। ওরা যতই অত্যাচারী হোক না কেন মেয়েরা রাস্তাজুড়ে বসে থাকলে তাদের শরীরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে না। ফলে মেয়েরা উদ্বুদ্ধ হয়ে গেল। বিকেলের দিকে টিভি চ্যানেলে কোনও কোনও বাড়ির বউ প্রশ্নের জবাবে বলল, 'পুলিশ এসে অকারণে আমাদের মারছে, বেইজ্জত করছে। আমরা আর সহ্য করব না। আমরা পুলিশকে বাধা দেব। প্রাণ যায় যাক, জমি দেব না।'

বিকেলের টিভিতে সেই দৃশ্য দেখানো হতেই জেলা পুলিশের বড়কর্তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রচুর মহিলা পুলিশ মোকাবিলা করার জন্যে পাঠানো হবে।

সন্ধে নামামাত্র আটটা দল শিবচরণপুরে, পাঁচটা বেঙ্কেমারিতে কাজে লেগে গেল কোদাল নিয়ে। গ্রামে ঢোকার চারটে গাড়ির রাস্তায় গর্ত খোঁড়া শুরু হল। চার ফুট উচ্চতা, তিন ফুট গভীর। প্রতিটি রাস্তার তিন জায়গায় এই কাজটি ওরা শেষ করল ভোরের অনেক আগে। এর ফলে কোনও গাড়ি আর গ্রামে ঢুকতে পারবে না। গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ বা পার্টির লোক যদি হেঁটে গ্রামে ঢুকতে চায় তা হলে সিকি থেকে আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে। তার

মধ্যে খবর হয়ে যাবে এবং ছেলেরা লুকিয়ে পড়তে পারবে। যতীন সাইকেল নিয়ে রাস্তা চারটের গর্ত খোঁড়ার কাজ দেখে নিল অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে। বেঙ্কেমারির বটগাছটার দিকের রাস্তায় একটা সাঁকো ছিল। বর্ষাকালে মাঠের জল ওই সাঁকোর তলা দিয়ে খালে গিয়ে পড়ে। এখন শুকনো। কয়েক জন অত্যুৎসাহী সেই সাঁকো ভাঙার চেষ্টা করল। পুরোটা সক্ষম না হলেও ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে গাড়ি যাতায়াতের আর উপায় রইল না।

ভোর হতে না হতে সবাই ফিরে গেল গ্রামে। ঠিক হল আজ রাত থেকে কেউ আর নিজের বাড়িতে শোবে না। গ্রামের উলটো প্রান্তে বাদায় যাওয়ার দিকটায় ছাউনি তোলা হবে। জায়গাটা জঙ্গলে ঘেরা বলে চট করে কারও নজরে পড়বে না।

সকাল দশটার সময় একটা পুলিশের জিপ, দুটো বড় ভ্যান এবং দুটো প্রাইভেট গাড়ি ভক্তহাট থেকে বেঙ্কেমারি বটগাছের পাশ দিয়ে এসে শিবচরণপুরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। জিপের পুলিশ এগিয়ে গিয়ে দেখল সাঁকোর অর্ধেক ভাঙা, ভ্যান দূরের কথা, জিপও ওর ওপর দিয়ে যাবে না।

ও সি-র নির্দেশে ওরা আর একটু এগিয়ে গ্রামের রাস্তায় ঢুকল। একটু এগোতেই গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ কেটে দেওয়া হয়েছে। ওই চওড়া গর্তের ওপর দিয়ে যে-কোনও গাড়ি যেতে পারবে না। দুটো প্রাইভেট গাড়ি থেকে জমি জরিপ করতে আসা অফিসাররা নেমে এসে দৃশ্যটা দেখলেন। ততক্ষণে টিভির গাড়ি এসে গেছে। ঝটপট ছবি তুলছে ওরা। ও সি-র ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্যে তাকে ঘিরে ধরল সবাই। ও.সি বললেন, 'এভাবে রাস্তা কে কেটেছে আমার জানা নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া অপরাধ। আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে গ্রামে ঢুকে অপরাধীদের খুঁজে বের করবই।'

কনভয় আবার ঘুরল। এবার তার আয়তন বেড়ে গেছে। টিভি এবং খবরের কাগজের গাড়িগুলো যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় রাস্তাতেও একই অভিজ্ঞতা হল। রাস্তা কাটা। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ও সি আট-দশজন পুরুষ-মহিলা পুলিশকে নিয়ে গর্ত পেরিয়ে হাঁটা শুরু করল। উদ্দেশ্য, গ্রামের লোকদের ধরে এনে রাস্তা বুজিয়ে দেবেন। কিন্তু মিনিট চারেক হাঁটতেই আবার একই দৃশ্য দেখলেন সবাই। আবার রাস্তায় গভীর খাদ কাটা হয়েছে। টিভির ক্যামেরায় সেসব ছবি তোলা হচ্ছিল। ও.সি

আমারবই.কম

ফিরে এলেন গাড়ির কাছে। সরকারি অফিসারদের জানালেন, গ্রামের ভেতর গাড়িতে যাওয়া যাচ্ছে না। ওঁরা যদি হেঁটে যেতে চান তা হলে তাঁরা ওঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। প্রায় আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে এবং তার পরে এক ফসলি জমির কাছে পৌঁছাতে আরও পরিশ্রম করতে রাজি হলেন না অফিসাররা। তাঁদের গাড়ি ফিরে গেল জেলা সদরে। জেলাশাসককে জানিয়ে দেবেন কেন তাঁদের পক্ষে সার্ভে করা সম্ভব হল না। অগত্যা পুলিশও ফিরে গেল।

এই সব ঘটনা আশেপাশের আড়াল থেকে লক্ষ করল জমি রক্ষা কমিটির কিছু সমর্থক। পুলিশ ফিরে যেতেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। তার ছোঁয়া লাগল গ্রামেও।

বিকেলে বেঙ্কেমারি, শিবচরণপুর এবং রানিচকে জমি রক্ষা কমিটি মাইকে ঘোষণা করল, 'এই আন্দোলন জোরদার করতে তিনটে গ্রামেই আগামীকাল দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বিপুল জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই জনসভায় ভাষণ দেবেন কলকাতার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।'

প্রচার শুরু হওয়া মাত্র জমি রক্ষা কমিটি উল্লসিত হল। বেঙ্কেমারি এবং শিবচরণপুরের গোঁড়া পার্টি-সমর্থকরা ইতিমধ্যে বিজুরি অথবা ভক্তহাটে চলে গেলেও রানিচকে আপাত শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু মাঠঘাট পেরিয়ে রাতারাতি জমি রক্ষা কমিটির সমর্থকরা মিলিত হয়ে গেল রানিচকের সঙ্গে। আগামিকালের জনসভার পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদা তোলা শুরু হয়ে গেল। যে সমস্ত বাড়িতে পার্টির সমর্থকরা থাকেন তাঁদের মোটা টাকা রাতারাতি চাঁদা দিতে বলা হল। চাঁদা চাওয়া লোকগুলোর ভাবভঙ্গিতে ভীত হয়ে পড়ে রাতারাতি পার্টির সমর্থকরা গ্রাম ত্যাগ করে চলে এলেন বিজুরিতে। বিজুরিতে ইতিমধ্যে আশ্রয় চাওয়া মানুষের ঢল নেমেছে। গোরা দত্ত সমেত নেতৃত্ব দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ঘনঘন জেলা কমিটির পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে। আর এই চাপ সামলাতে না পেরে পার্টির নিচুতলার কর্মীরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে বিজুরিতে বাস করা বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়ি আক্রমণ করল। সেই দলবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মানুষগুলোর ছিল না। ফলে মধ্যরাতে তারা দলে দলে ছুটল বেঙ্কেমারি, শিবচরণপুরের দিকে। কিন্তু ওই দুটি গ্রামের জমি রক্ষা কমিটি তাদের অনায়াসে ঢুকতে দিল না। তাদের সন্দেহ হল এই দলের সঙ্গে লুকিয়ে পার্টির লোকজন চলে আসতে পারে। রীতিমতো পরীক্ষা করে যখন

বোঝা গেল তেমন একজনও এই দলে নেই, তখন তাদের স্কুলের মাঠে নিয়ে আসা হল। উদ্বাস্তু-শিবির তৈরির আয়োজন আরম্ভ হল। খবরটা রানিচকে পৌঁছানো মাত্র মানুষ খেপে গেল। পার্টির সমর্থকদের ফেলে যাওয়া বাড়িতে আগুন দেওয়া হল।

যতীন গগনকে ডেকে বলল, 'যারা নিজের বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে আমাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের দেখাশোনা করা আমাদের কর্তব্য। তুমি দায়িত্বটা নাও।'

'কীভাবে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার সঙ্গে আমি এদের ছয়জনকে দিচ্ছি। আপাতত দু'বেলা খিচুড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলের কুয়ো থেকে জল পাবে।' যতীন বলল।

'কিন্তু খিচুড়ি খাওয়াতেও টাকা লাগবে—।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। গৌরাঙ্গর কাছ থেকে টাকা নেবে।'

গগন রাজি হয়ে গেল।

যে ছয়জন ছেলেকে তার সঙ্গে দেওয়া হল তারা সবাই বিজুরি থেকে এসেছে। সকাল হতেই দুটো বড় উনুন খোঁড়া হল। গণপতি মণ্ডলের ক্যাটারিং-এর ব্যবসা ছিল। তার কাছ থেকে বড় বড় হাঁড়ি কড়াই আনা হল। গৌরাঙ্গ এসে জানিয়ে দিল, 'আজ বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল ডাল আলু জোগাড় কর। কাল থেকে টাকা দিতে পারব।'

গগনের মনে হল এটা করলে গ্রামের মানুষ শরণার্থীদের সঙ্গে একাত্মবোধ করবে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে একমুঠো চাল আল ডাল সংগ্রহ করতে শুরু করল তার দল। কিন্তু এতে অনেকেই আপত্তি জানাল। কাল বিকেলে চাঁদা বাবদ দশ টাকা দিতে হয়েছে, আবার এখন চাল ডাল চাওয়াটা জুলুম হয়ে যাচ্ছে না? গগনকে ছুটে যেতে হচ্ছিল বোঝাতে। শরণার্থীরা তাদের গ্রামের অতিথি। ওরা যে কাল রাতে এখানে আশ্রয় নিতে আসবে তা কেউ সন্ধেবেলাতেও বুঝতে পারেনি। বাধ্য হয়ে যারা এসেছে তাদের অভুক্ত রাখা কি মানবিক কাজ হবে? আবেদনে কাজ হল।

উনুনে কাঠ জ্বলল। খিচুড়ি আর আলুভাজার আয়োজন শুরু হল বাহান্ন জন নারীপুরুষের জন্যে। গগন খুব উৎসাহিত। তার ছোট ভাই এসে দু'বার ইশারায় বুঝিয়েছে বাড়িতে ডাকছে। সে কান দেয়নি। শেষ পর্যন্ত

আমারবই.কম

স্বেচ্ছাসেবকদের একজন বলল, 'আপনি বাড়ি থেকে ঘুরে আসুন গগনদা, আমরা তো আছি।'

বাড়িতে ঢুকে গগন অবাক। গ্রামের প্রচুর মেয়ে এখন তাদের বাড়িতে। মা বলল, 'তুই সকালে কিছু খেয়েছিস?'

গগন বলল, 'আরে। এখন কি ওসব ভাবার সময়?'

বন্যা বলল, 'কিছু মনে করবেন না, যে কাজটা মেয়েরা ঠিকঠাক করতে পারে সেই কাজটা আপনি, আপনারা কেন করছেন? আপনি তো আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন। মাসিমা এই কথা বলার জন্যে আপনাকে খবর দিয়েছিল।'

'মেয়েরা করবে?' ফাঁপড়ে পড়ে গেল গগন।

'রান্না করে মেয়েরাই তো ছেলেদের খাইয়ে এসেছে।' একটি মেয়ে বলল।

বন্যা বলল, 'আপনি শরণার্থীদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়েছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে যেসব মেয়ে শক্তপোক্ত তাদের কাজ করতে ডাকেননি।'

গগন বলল, 'তা হলে আপনি কী প্রস্তাব দিচ্ছেন বলুন?'

'মেয়েরাই কাজটা করবে। প্রতিদিন নতুন নতুন করে মেয়েরা যাবে যাতে কারও ওপর বেশি চাপ না পড়ে।' বন্যা বলল।

'বেশ। কিন্তু একজনকে তো দায়িত্ব নিতে হবে!' গগন বন্যার দিকে তাকাল।

মা ডাকলেন, 'এই, এ দিকে আয়।'

গগন অবাক হয়ে দেখল ঝরনা ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। সে না বলে পারল না, 'ঝরনা! যদুকাকা ওর কী অবস্থা করবে তা কল্পনা করেছ?'

মা জবাব দেওয়ার আগে ঝরনা মুখ খুলল, 'আমি কচি খুকি নই। যা ভাল মনে করছি, তাই করছি। যে বাবা গ্রামের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার ভয়ে আমি ঘরে লুকিয়ে থাকব কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল। গগন বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যখন চাইছ তখন আমি যতীনদের বলছি।'

বন্যা বলল, 'প্রয়োজন হলে আমি যতীনবাবুর সঙ্গে কথা বলব। ঝরনাকে নিয়ে আমরা এখনই ক্যাম্পে যাচ্ছি।'

স্কুলের মাঠেই গৌরাঙ্গর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গৌরাঙ্গ খুব উত্তেজিত। কলকাতার সব ক'টা টিভি চ্যানেলে শিবচরণপুরের খবর দেখানো হচ্ছে। সরকারি অফিসারদের নিয়ে পুলিশ বাহিনী গ্রামে ঢুকতে গিয়ে রাস্তা কাটা থাকায় কীভাবে আটকে গিয়েছে তার ছবি। বলা হচ্ছে পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ। জেলাশাসককে সরকার বলেছেন কঠিন হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে।

গগন গৌরাঙ্গকে মেয়েদের ইচ্ছের কথা জানাল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে গৌরাঙ্গ বোতাম টিপে যতীনকে ধরে কথাগুলো বলতেই যতীন বোধহয় গগনকে সেটটা দিতে বলল। ওটা কানে চেপে হ্যালো বলতেই যতীন বলল, 'এর চেয়ে ভাল আর কিছুতেই হয় না। তুমি ওদের ওপর দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে দিয়ে দাও। বন্যাকে বলবে টাকার দরকার হলে গৌরাঙ্গকে কন্ট্যাক্ট করতে। আমরা আজ বিকেলের মধ্যে ডবল ডোনেশন পেয়ে যাব। তুমি গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের এখানে চলে এসো।'

সেট ফেরত দিয়ে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'যতীনরা এখন কোথায় আছে?'

'কেন?'

'ও আমাকে যেতে বলল।'

'গোবধর্নের মাছের গুদামে!'

'সে কী? অত দূরে গিয়ে কী করে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে?' গগন অবাক।

'দিনের বেলায় ওখানে থাকবে। তার কারণও আছে।'

মেয়েরা এল। আট জন। তাদের নেতৃত্বে ঝরনা। তারা গৌরাঙ্গর সঙ্গে কথা শুরু করলে গগন বাড়ির পথ ধরল। খুব অস্বস্তি হচ্ছে গোবর্ধনের মাছের গুদামে যেতে। গোবর্ধনের কীর্তি তার কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও সে কুসুমের সঙ্গে লাম্পট্য চালিয়ে যাচ্ছে। ওর মুখোমুখি হলে ওর মুখ থেকে প্রতিবাদ বেরিয়ে আসবেই। অথচ এই আন্দোলনে গোবর্ধনের যে ভূমিকা তা নিশ্চয়ই জমি রক্ষা কমিটির সদস্যরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখছে। অর্থবান গোবর্ধন নিশ্চয়ই নানা ভাবে সাহায্য করছে ওদের। যতীনদের কাছে গোবর্ধনের বিরুদ্ধে কিছু বললে কোনও কাজ হবে না। হয়তো বলবে ওটা গোবর্ধনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে এতকাল কুসুম বা তার বাবা কার্তিক পঞ্চায়েতের কাছে কোনও নালিশ করেনি। কুসুমের স্বার্থের চেয়ে গ্রামের

আমারবই.কম

স্বার্থ অনেক বেশি মূল্যবান। তবে ওই গুদামে রাত কাটালে যতীনরা নিশ্চয়ই কুসুমের চিৎকার, কান্না শুনতে পাবে। কার্তিক যতই তার মুখে হাত চাপা দিক। মাথা নাড়ল গগন, গৌরাঙ্গ বলল ওরা দিনের বেলায় মাছের গুদামে থাকবে, রাত্রে চলে আসবে গ্রামে। তার মানে রান্নায় সময় থাকবে না।

বাড়িতে এখন ভিড় নেই। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'খাবার মতো কিছু আছে?'

মা বলল, 'রুটি আর তরকারি খাবি?'

'তাই দাও।'

হাতমুখ ধুয়ে এসে সে দেখল বন্যা বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। সে বলল, 'আপনার মেয়েরা একসঙ্গে কাজে লেগে গেছে।'

বন্যা হাসল, 'যার যা কাজ তাকে তাই করতে দেওয়াই ভাল।'

গগন মায়ের হাত থেকে প্লেট নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কী কাজ বলুন?'

'তা হলে একটু বসি।' একটা মোড়া টেনে নিয়ে বন্যা বলল, 'আপনি খাওয়া শুরু না করলে কথা বলতে পারব না।'

রুটি ছিঁড়ে তাই দিয়ে তরকারি তুলে মুখে পুরল গগন। বন্যা বলল, 'আগেই বলি, আমার কথা আপনার ভাল নাও লাগতে পারে।'

খেতে খেতে গগন মাথা নেড়ে বলল, 'বলুন।'

'আপনার মায়ের কাছে শুনেছি আপনাদের এক ফসলি জমি রয়েছে। প্রস্তাবিত শিল্পের জন্যে জমি অধিগ্রহণ করা হলে আপনাদের জমিও নেওয়া হবে। আপনাদের আশেপাশের জমি ইতিমধ্যে মাড়োয়ারিরা কিনে ফেলেছে। অধিগ্রহণ করার সময় সরকার জমির যে দাম দেবেন সেটা অনুমান করে ওরা অনেক কম দামে জমি কিনেছে। আপনাদেরটা পেলে জমির দাম আরও বেড়ে যেত। যাক, আপনারা জমি বিক্রি করেননি। কিন্তু এই যে জমি রক্ষা করার জন্যে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আপনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি। চায়ের দোকানের মালিক খুন হয়েছেন এবং সেখানে দুপুর পর্যন্ত ছিলেন বলে পুলিশ তার দায় আপনার ওপর চাপিয়েছে বলে আত্মরক্ষার জন্যে দু' রাত কোথাও লুকিয়েছিলেন। কোনও মিছিল বা মিটিং-এ আপনাকে দেখা যায়নি। এমনকী ওরা যখন রাত জেগে রাস্তা কাটল তখনও আপনাকে দেখা যায়নি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত। তাই আমার সঙ্গে

জমি রক্ষা কমিটির কাছে গিয়ে অহিংসার পথে আন্দোলনের কথা বলেছেন। একদল বন্দুক বোমা নিয়ে আক্রমণ করবে আর আপনি গ্রামের লোকদের বলছেন রঘুপতি রাঘব রাজা রাম গাইতে। এর ফলে এখানকার মানুষ যদি সন্দেহ করে, যদি বলে আপনি এত কাল সরকারি পার্টির সমর্থক ছিলেন তাই ওদের বিরুদ্ধে লড়তে চান না তা হলে কি এরা অন্যায় করবে? এ সব কথা না বলে আপনি যদি নির্বোধ মেরুদণ্ডহীন হয়ে বাড়িতে বসে থাকতেন তা হলে কারও কিছু বলার ছিল না। গ্রামের মানুষ তবু আপনার বিরুদ্ধে যায়নি কেন জানেন? প্রথমত আপনার মা মেয়েদের সঙ্গে আন্দোলনে আছেন, আপনার বোবা ভাই কিছু বুঝুক বা না-বুঝুক সবসময় মিটিং মিছিলে যোগ দিচ্ছে। আর দু' নম্বর হল যতীনবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আপনাকে আড়াল করছে। কিন্তু মনে রাখবেন যতীনবাবু একাই জমি রক্ষা কমিটি নন। অথচ এই গ্রামের ছেলেদের মধ্যে আপনিই বেশি দিন কলকাতায় আছেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করলে লোকের কাছে স্বাভাবিক হত।' বন্যা থামল।

'হ্যাঁ। সত্যি বলেছেন। আমি দ্বিধাগ্রস্ত।' গগন স্বীকার করল।

'পার্টির প্রতি এত দিনের বিশ্বস্ততা থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারছেন না। এটা বোঝা যায়। আবার পার্টির লোকই আপনাকে খুনি সাজিয়েছে বলে আপনি বিজুরিতে চলে যেতে পারছেন না।' বন্যা উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি।'

'আপনার কী মনে হয়?' অন্যমনস্ক গলায় বলল গগন।

'বা রে। আমি কী বলব? তবে যদি দ্যাখেন কোনওটাই মানতে পারছেন না তা হলে কোনও মতে এখান থেকে বেরিয়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে পৌঁছে গেলে আপনি এ সব সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।' বন্যা বলল।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে মা এতক্ষণ এসব কথা শুনছিল। এবার বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'ও ঠিকই বলেছে। তুই কলকাতায় ফিরে যা। বেঙ্কেমারি ভাঙড়হাটের দিকে না গিয়ে পুব দিক দিয়ে হেঁটে গেলে যদি ভ্যানরিকশা পেয়ে যাস তা হলে ডায়মন্ডহারবারের বাস পেয়ে যাবি। সেখান থেকে ট্রেন ধরলে আর কোনও ভয় নেই।'

বন্যা বেরিয়ে গেল। গগন বলল, 'হুঁ। দেখছি।'

মা সামনে থেকে সরে গেলে চুপচাপ খাওয়া শেষ করল সে। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা যদি নির্বোধ মেরুদণ্ডহীন হয়ে থাকা হয়, তা হলে লুকিয়ে

আমারবই.কম

কলকাতায় চলে যাওয়াও তো একই ব্যাপার হবে। বন্যা যে তাকে এতটা অপছন্দ করছে তা সে আগে বুঝতেই পারেনি। আচ্ছা সে যদি ভক্তহাটে গিয়ে স্বপনদাকে অনুরোধ করে গোরা দত্ত আর এম এল এ স্বপনের সঙ্গে বসে এই সমস্যার সমাধান করে দিতে তা হলে মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে উনি কি রাজি হবেন না? স্বপনদা পদত্যাগ করলেও এখনও পার্টির সদস্য হিসেবে রয়েছেন। ওঁকে গোরা দত্ত একসময় মান্য করত। স্বপনদাকে যদি রাজি করানো যায় তা হলে অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে যাবে। এভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিতে হবে না। কিন্তু ভক্তহাটে কীভাবে যাবে সে? একমাত্র রাস্তা, বিকাশ যদি তাকে সাহায্য করে। বিকাশ নিশ্চয়ই খবর রাখে যে সে জমি রক্ষার মিটিং মিছিলে এখনও যায়নি। বিজুরির কোনও ছেলেকে ধরে বলতে হবে বিকাশকে খবর দিতে। সে কথা বলতে চায়। বিজুরিতে ঢোকার মুখে যে সাঁকো সেখানে সে অপেক্ষা করতে পারে।

গগন যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছে তখন দূরে বোমের আওয়াজ শোনা গেল। পরপর বোমা ফাটছে। দ্রুত পা চালাল গগন। মানুষজন ছোটাছুটি করছে। একজনকে থামাল গগন, 'কী হয়েছে?'

'পার্টি বোমা ফাটাচ্ছে। ইয়া বড় বড় বোমা।' লোকটা হাত বড় করে দেখাল।

'দখল করে নিয়েছে।' হঠাৎ কোথা থেকে মদন চলে এল সামনে। হেসে বলল, 'হয়ে গেল। ওরা দখল করে নিয়েছে।'

'কী দখল করেছে?'

'ভাঙা সাঁকো মেরামত শুরু করে দিয়েছে। যে ওদিকে যাবে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে বোমা মেরে।' বলে হাসতে লাগল মদন।

'তোমাকে কিছু বলল না?'

'আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমাকে কেন বলবে?'

'ওখানে বিকাশকে দেখলে?'

'বিকাশ?'

'হ্যাঁ। পার্টির একজন নেতা।'

'ছিল হয়তো। আমি চিনি না। ওরা সাঁকো সারাবে, তারপর গর্তগুলো বোজাতে বোজাতে গ্রামটা দখল করে নেবে। হি হি হি।' হাসল মদন।

'তাতে তোমার কী লাভ হবে?' রেগে গেল গগন।

'লাভ হবে না? এখন তো গ্রামে সব পকেটখালির জমিদার। একটা টাকাও ধার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ওরা দখল নিলে মালদার মানুষ ঘরে ফিরে আসবে। আমার ধার পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।' মদন চলে গেল।

আবার বোমার আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা পটকার নয়, বেশ জোরালো। গগনের মনে হল ওরা যদি বোমা ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসে তা হলে শিবচরণপুরের মানুষের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না। এভাবে তো সমঝোতা হবে না। একতরফা আক্রমণ করে যাবে একদল আর অন্যদল তার সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে যাবে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল বিজুরির মানুষ বোমা পেল কোত্থেকে? তখনই অন্যরকম শব্দ কানে এল। কেউ চিৎকার করে উঠল, 'গুলি ছুড়ছে, গুলি ছুড়ছে।'

গগন থমকে গেল। তারপর দৌড়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখল দুটি ছেলে সাইকেলে বসে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছে। সে ওদের বলল, 'আমাকে তোমরা একটু গোবর্ধনের মাছের গুদামে পৌঁছে দেবে? খুব জরুরি।' ছেলে দুটো রাজি হল।

ছেলেদুটো যেন কাজ পেয়ে খুব খুশি হল।

গুদামে পৌঁছবার আগেই ওদের থামানো হল। সাইকেলের ছেলেদের ফেরত পাঠিয়ে গগনকে নিয়ে একজন চলে এল গুদামের পেছনের উঠোনে। গগন দেখল কার্তিকের ঘরদুটোর দরজা বন্ধ। যতীনরা আলোচনা করছিল। গগনকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'রান্নার দায়িত্ব মেয়েরা নিয়ে নিয়েছে।' গগন বলল।

'বাঃ, খুব ভাল খবর। এটা বোধহয় বন্যার জন্যে সম্ভব হয়েছে।' যতীন অন্যদের দিকে তাকাল, 'ওরা যতই বোমা ছুড়ুক, গুলি চালাক, নেত্রীর সভা বিকেলে হবেই।'

গগন না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'কী করে হবে। উনি আসবেন কী করে?'

'গাড়ি ছাড়াও আসা যায়। আমরা মোটরবাইকে চাপিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু বিজুরির দিক দিয়ে নয়, উলটো দিকের রাস্তায় তাঁকে আনা হবে।' তারপর দুটো অল্পবয়সি ছেলেকে বলল, 'যাও, তোমরা প্রচারে বেরিয়ে যাও।'

ছেলেদুটো চলে গেল। গগন দেখল যারা যতীনের সঙ্গে বসে আলোচনা করছে, তাদের অনেককেই সে চেনে না। একেবারে নতুন মুখ।

গগন বলল, 'ওরা ভাঙা সাঁকো দখল করেছে। শুনলাম গ্রামের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। ওরা বোমা বা গুলি ছুড়ছে বলে কেউ বাধা দিতে পারছে না। তা হলে তো ওরা শক্তি দেখিয়ে গ্রাম দখল করে নেবে।'

'নেবেই তো। তুমি বলেছিল যে রক্তক্ষয় যাতে না হয় তার চেষ্টা করতে। ওদের ঢোকা বন্ধ করতে আমরা রাস্তাগুলোতে শুয়ে পড়তে পারি। একেবারে অহিংস আন্দোলনও। ওদের ঢোকা বন্ধ করতে পারব? ওরা বোমা মেরে আমাদের রক্তাক্ত করবে না তার কোনও গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে?' যতীন জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল গগন, 'না।'

'তাই আমরাও পালটা আঘাত করব। জনসভা শেষ করে নেত্রী ফিরে গেলে আমরাও অ্যাকশনে নামব গগন।' যতীন জানিয়ে দিল।

'খালি হাতে সেটা কী করে সম্ভব?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'খালি হাতে নয়, আমাদের এই বন্ধুরা সাহায্য করছেন।' হাত নেড়ে বসে থাকা গম্ভীর মানুষগুলোকে দেখাল যতীন।

এই সময় কার্তিক এসে যতীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। যতীন তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মাথা নাড়তে কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, 'খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে। কখন দেব?'

'এঁদের দিয়ে দাও। এঁরা অনেক দূর থেকে এসেছেন। এঁদের খাওয়া হয়ে গেলে আমাদের দিয়ো।' যতীন উঠে দাঁড়াতে কার্তিক ফিরে গেল তার ঘরে।

এই সময় মোবাইল বেজে উঠল। যতীন পকেট থেকে যন্ত্রটা বের করে বোতাম টিপে কানে চেপে বলল, 'হ্যালো! কে? হ্যাঁ যতীন বলছি শিবচরণপুর থেকে। বলুন দাদা। কী? সর্বনাশ! তা হলে কী হবে? ও। এটা ওরা পারে নাকি? না, নেত্রী এলে এখানে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনাই নেই। ও, ও। আচ্ছা—!' সুইচ অফ করল যতীন।

'কী হল?' একজন প্রশ্ন করল।

'নেত্রীর কনভয় পুলিশ জাতীয় সড়কে আটকে দিয়েছে। বলেছে উনি এলে এখানে শান্তিভঙ্গ হতে পারে তাই ওরা আসতে দেবে না। সুবল, তুমি চব্বিশ ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকবে। যে কোনও জরুরি খবর কাউকে দিয়ে আমার কাছে পাঠাবে। তোমার বাড়িতে তো টিভি আছে!' যতীন যার দিকে

তাকিয়ে কথাগুলো বলল, সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার মাথা নেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

যতীন বলল, 'ওরা ভয় পেয়েছে তাই নেত্রীকে আসতে দিল না। ছলে বলে কৌশলে ওরা এলাকা দখল করে দেশি-বিদেশি শিল্পপতির হাতে আমাদের জমি তুলে দিতে চাইছে। আমরা তা মানছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান উঠল, 'জমি বাঁচাও, শিল্প হঠাও। শিল্পের নামে ধাপ্পাবাজি চলবে না, চলবে না।'

একতলার বারান্দায় কলাপাতায় খিচুড়ি আর আলুবেগুন ভাজা পরিবেশন করছিল কার্তিক। দশ জনের দলটা বসে গেল খেতে। যতীন গগনকে ইশারা করল বাইরে আসতে। গগন এলে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে যতীন বলল, 'গোবর্ধন গিয়েছে আলতায়। ওর আজ সকালে ফিরে আসার কথা। এখানে পৌঁছতে কাল দুপুর হয়ে যাবে। ওকে আবার আলতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই না। কিন্তু এখনই আমাদের একজনের সেখানে যাওয়া দরকার। তুমি যাবে?'

'আমি তো কোনও দিন ওদিকে যাইনি। রাস্তাই চিনি না।' গগন বলল।

'পনেরো কিলোমিটার হাঁটতে হবে। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। আমি গেলে এ দিকটা সামলে নিতে সমস্যা হবে। গৌরাঙ্গকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু ওর বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা কম।'

'আলতায় গিয়ে কী করতে হবে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'কাল রাত্রে বা পরশু সকালে পনেরো জনের একটা দল জলপথে ওখানে আসবে। তাদের পথ চিনিয়ে এখানে আনতে হবে।' যতীন বলল।

'তারা কারা?'

'যারা আমাদের এই সংগ্রামে সাহায্য করবে। কিন্তু তাদের নামধাম অস্তিত্ব আমরা কখনওই প্রকাশ করব না। প্রেস বা টিভি মিডিয়াকে তো নয়ই।' যতীন বলল।

'এরা কি ভাড়াটে গুন্ডা?'

'দূর! এরা এদেশে বিপ্লব চায়। এদের নীতি আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সুযোগ পেলে সেটা ছাড়ব কেন?'

'কিন্তু এত দিন আমরা চুপচাপ ছিলাম। ওরা আসামাত্র আমাদের শক্তি বেড়ে গেলে যে কেউ সন্দেহ করবে না?'

আমারবই.কম

'না। করবে না। কারণ আজ রাত থেকে আমরা পালটা অ্যাকশন আরম্ভ করব। মনে রেখো, এসবই আমরা করছি পৈতৃক জমি বাঁচানোর জন্যে। গগন, তোমার সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না। তুমি এই কাজটা করে দিলে আর কারও কিছু বলার থাকবে না।' যতীন বলল।

'কিন্তু এই বাদা অঞ্চল আমার একদম অজানা।'

'কার্তিককে সঙ্গে দিচ্ছি। সে গোবর্ধনের সঙ্গে কয়েকবার ওখানে গিয়েছে।'

যতীন চিৎকার করে কার্তিককে ডাকতে সে দ্রুত চলে এল কাছে। যতীন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো আলতায় যাওয়ার রাস্তা চেনো। গগনকে নিয়ে যাও সেখানে।'

'আমি?' কার্তিক নিজের বুকে হাত রাখল।

'অসুবিধে আছে?'

'আমার কোনও অসুবিধে নেই। আপনাদের হবে। এই এত লোকের রান্না দু'বেলা কে করবে? হুট করে পুলিশ এলে আপনারা হয়তো লুকিয়ে পরবেন কিন্তু আমি না থাকলে তাদের কে সামলাবে? তা ছাড়া পায়ের বড় ব্যথা। বাতে ধরেছে। অত দূর হাঁটতে পারব না।'

কার্তিকের কথা শুনে মাথা নাড়তে লাগল যতীন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আর কেউ আছে যে পথটা চেনে?'

কার্তিক চোখ বন্ধ করে ভাবল খানিক। তারপর মাথা নাড়ল, 'না। তবে—!'

'তবে কী?'

'আমার মেয়ে কুসুমকে বলতে পারি। ও একবার গিয়েছিল।'

'সে কী! তোমার মেয়ে আলতায় গিয়েছিল?'

'আজ্ঞে, আমার সঙ্গেই গিয়েছিল। তখন ডাকাবুকো ছিল তো।'

'অ। তা সে কি একা গগনের সঙ্গে যেতে রাজি হবে?' যতীন জিজ্ঞাসা করল।

'বড়বাবু তো ওখানে গিয়েছেন। সেটা জেনেছে বলে রাজি হতে পারে।'

'তা অবশ্য। মেয়েরা চেনাজানা মানুষ থাকলে ভরসা পায়।' যতীন বলল, 'তা তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো—।'

কার্তিক চলে গেলে যতীন গগনকে বলল, 'গোবর্ধন যে চলে আসছে তা

এখনই কার্তিকের মেয়েকে বলার দরকার নেই। পথে যদি দেখা হয়ে যায় আর ও যদি গোবর্ধনের সঙ্গে ফিরে আসতে চায়, তা হলে গোবর্ধনের সঙ্গে ওর যে কর্মচারীরা গিয়েছে তাদের কাউকে বোলো সঙ্গে যেতে।'

গগন ইতস্তত করল, 'যতীন, একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

যতীন মাথা নাড়ল, 'এটা স্বাভাবিক সময় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সামাজিক নিয়মগুলো কেউ মানতে পারে না। তাছাড়া তুমি নিজের স্বার্থে যাচ্ছ না। তোমার যাওয়ার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এসব ভাবনা মাথা থেকে সরাও।'

কার্তিক এসে জানিয়েছিল অনেক কষ্টে সে কুসুমকে রাজি করিয়েছে। পথের জন্যে জল এবং খাবার নিয়ে যাওয়া জরুরি। কুসুমকে সে বলেছে যতটা পারে রান্না করে সঙ্গে নিতে। যতীন ঘড়ি দেখল। ঠিক দুটো নাগাদ গগনকে রওনা হতে বলল সে।

বাড়িতে ফিরে এসে গগন দেখল ছোট ভাই ছাড়া কেউ নেই। সে স্বস্তি পেল। আলতায় যাচ্ছে শুনলে মা নিশ্চয়ই আপত্তি করত। সে ভাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আজ বাড়িতে?'

সে আঙুল তুলে বোঝাল তাকে বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে।

'মা রান্না করে গেছে?'

মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলল ভাই।

'তুই আমাকে ভাত বেড়ে দে, আমি স্নান করে আসি।'

খাওয়া শেষ করে কাঁধের ঝোলাব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে ভাইকে গগন বলল, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তিন দিন বাদে ফিরব। মাকে বলে দিস।'

ভাই আঙুল নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'কাছেই, বেশি দূরে নয়।' বেরিয়ে পড়ল গগন।

বাড়ির সামনে একটা ছেলে সাইকেলে বসেছিল মাটিতে পা রেখে। তাকে দেখে বলল, 'যতীনদা আপনাকে নিয়ে যেতে বলল।'

খুশি হল গগন। আসার সময় এতটা পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছিল। এখন সাইকেলের ক্যারিয়ারে চেপে এল। আসার সময় শুনল দূরে বোমা

আমারবই.কম

ফাটছে। যতীন একটা প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটিকে বিদায় করে সে প্যাকেটটা গগনের হাতে দিল, 'খুব সাবধানে, যত্ন করে রাখবে এটাকে। আলতায় যাওয়ার পর ওরা এলে ওদের নেতার হাতে দিয়ে দেবে। লোকটার নাম হরিপ্রসাদ।'

'কী আছে এতে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

একটু ইতস্তত করে যতীন বলল, 'টাকা।'

গগন প্যাকেটটা নিয়ে তার ঝোলা ব্যাগে রাখল। যতীন বলল, 'সোজা এই পথ ধরে চলে যাও। মিনিট দশেক পর একটা ভাঙাচোরা খড়ের ঘর দেখতে পাবে। কার্তিক তার মেয়েকে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে। যাও।'

গগন হাঁটা শুরু করল। যেতে যেতে একটা গাছের শক্ত ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে নিল সে। এই কাঁটা গাছ আর বুনোঝোপে সাপ ছাড়াও অনেক কিছু বিপদ বাড়াবার জন্যে তৈরি থাকবে। লাঠিটা অন্তত কিছুটা কাজে আসবে।

পোড়ো খড়ের ঘরটা দেখতে পেল সে। কাছে যেতেই কার্তিক বেরিয়ে এল, 'আপনার সঙ্গে আর কেউ আসেনি তো বাবু?'

'না। কেন?'

'বুঝতেই পারছেন, মানুষের জিভ কী মারাত্মক। খবরটা পেলেই বদনাম রটাবে।'

'না। সেই ভয় তোমার নেই। তবে রাস্তায় তো গোবর্ধন এবং তার দলের দেখা পাব।'

কার্তিক মাথা নাড়ল, 'ওদের নিয়ে কোনও ভয় নেই। বড়বাবুর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাবে না। এটা রাখুন বাবু। কাজে লাগবে।'

একটা শক্ত লম্বা ছুরি এগিয়ে দিল কার্তিক, 'এদিকে সাপ ছাড়া তেমন কোনও ভয়ংকর জন্তু নেই। তবুও। আর একটা কথা, ও যদি বড়বাবুর সঙ্গে ফিরে আসতে চায় তা হলে আপনি ছেড়ে দেবেন। ট্রলারের ড্রাইভারটাকে বললে সে আপনাকে আলতায় নিয়ে যাবে। এই কুসুম এ দিকে আয়।'

যেভাবে পা ফেলে পোড়ো ঘরের ওপাশ থেকে কুসুম বেরিয়ে এল তাতে মনে হল তাকে বাধ্য করা হচ্ছে বলেই যাচ্ছে। পরনের শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। হাতে একটা বড় থলে। কার্তিক বলল, 'যা, বাবুকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যা।'

'গত জন্মে অনেক পাপ করেছি না হলে এরকম বাপ কপালে জোটে।

আমি কাউকে পথ চেনাতে পারব না। যার দরকার সে যেন পেছন পেছন আসে।' হাঁটা শুরু করল কুসুম। বুনো ঝোপের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ ধরে কিছুটা হাঁটতেই মনে হল সভ্যজগতের বাইরে চলে এসেছে, গগন পেছন ফিরে তাকাল। ঝোপের আড়ালে চলে গেছে চেনা পৃথিবী। কুসুমের গলা কানে এল, 'পেছনে বুঝি সতীলক্ষ্মীটাকে ফেলে আসা হয়েছে যে ঘুরে ঘুরে না দেখলে মন মানছে না।'

গগন কথা বলল না। এই মেয়ের জিভ এমন যে কথা বলাই মূর্খামি হবে। রাস্তাটা সরু হয়ে গেল। দু' পাশের কাঁটা গাছগুলো বড্ড কাছাকাছি। কুসুম বলল, 'হাতে তো সোহাগ করে লাঠি নেওয়া হয়েছে, ওটাকে কেষ্টর বাঁশি বানিয়ে না রেখে সামনে হেঁটে ডালগুলো সরাতে সরাতে চললে ভাল হয় না?'

অগত্যা এগিয়ে গেল গগন। লাঠির আঘাতে ডালগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে ভাবল এই পথ দিয়ে যদি গোবর্ধনরা গিয়ে থাকে তা হলে ওদেরও ডাল সরাতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ডালগুলো আবার পথ আগলাল কী করে?'

মিনিট কুড়ি যাওয়ার পর প্রথম সাপ দর্শন করল গগন। দেখামাত্র আঘাত করতে সাপটা গাছ থেকে পড়ে গেল নীচে। পেছন থেকে মন্তব্য ভেসে এল, 'এই সাপটা কামড়ালে নিজের নাম মনে করার সুযোগ পাওয়া যেত না।'

গগন মৃত সাপটাকে দেখল একবার। চেহারা বেশ নিরীহ। হঠাৎ পায়ের নীচে ভেজা ঘাসের জঙ্গল দেখতে পেল গগন। মাঝে মাঝে জল জমে আছে। ইদানীং বৃষ্টি হয়নি এ দিকে, তা হলে জল এল কোথা থেকে। ঘাসজলে গোড়ালি বসে যাচ্ছে। এলাকাটা পার হতে না হতে আলো নিভে এল। পথটা এবার একটু ওপরে উঠে গেছে। কুসুম দাঁড়াল, 'সারা রাত তো হাঁটা যাবে না। অবশ্য সাপের কামড় বা শুয়োরের দাঁত শরীরে নিতে চাইলে অন্য কথা।'

গগনেরও একই কথা মনে হচ্ছিল। এতটা পথ যেহেতু সে কুসুমের সঙ্গে কথা বলেনি তাই নিজে থেকে রাত্রে কী করা হবে জিজ্ঞাসা করেনি। সে পেছন ফিরে দেখল কুসুম মুখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছে।

'আমাকে না দেখে একটা কাঁঠাল গাছের হদিস নিলে ভাল হয়।' কুসুম বলল না তাকিয়ে। গগন বলল, 'কাঁঠাল গাছ?'

'আকাশ থেকে পড়ল যেন। হ্যাঁ, কাঁঠাল গাছ। কেউ কাঁঠাল খাবে বলে এখানে লাগায়নি। আর একটু এগোতে হবে।'

আমারবই.কম

পাতলা অন্ধকার এখন পৃথিবীজুড়ে। হঠাৎ কুসুম বলল, 'এসে গেছি।'

তারপর রাস্তার বাঁ দিকে একটা বড় গাছের দিকে এগিয়ে গেল। গগন অবাক হয়ে দেখল গাছটার গায়ে বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের চালের ছাউনি রয়েছে। নীচে অনেকটা বড় কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া মাদুর পাতা। কুসুম তার বড় ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কুপি বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরাতে জায়গাটা আলোকিত হয়ে গেল। সেটা এক পাশে সরিয়ে রেখে মাদুরের ওপর বসে পড়ল সে, 'বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখা যাবে না, পোকায় ভর্তি হয়ে যাবে চৌদিক। সঙের মতো না দাঁড়িয়ে বসে পড়লেই তো হয়। মাদুর পরিষ্কার আছে।'

খানিকটা তফাতে বসল গগন। যদিও মাথার ওপর খড়ের ছাউনি কিন্তু চারদিক খোলা। হাওয়ায় কুপির আগুন কাঁপছে। নিশ্চয়ই গোবর্ধনরাই এটা বিশ্রামের জন্যে বানিয়ে রেখেছে। অন্তত বৃষ্টি হলে ভিজতে হবে না।

দূরে শিয়ালের ডাক শোনা গেল। তারস্বরে ডাকছে। বিরক্ত হল কুসুম, 'আ গেল যা।'

তারপর উঠে গাছের নীচ থেকে মরা ডাল কুড়োতে লাগল। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ধমক দিল, 'সামনে গোটা রাত পড়ে আছে। আগুন না জ্বালালে তেনারা চলে আসতে পারেন। দয়া করে গতর নাড়িয়ে গাছের ডাল জোগাড় করলে ভাল হয়। কাঁচা ডালে ধোঁয়া ছাড়বে, আগুন জ্বলবে না।'

একটু ওপাশে যেতেই গগন গাছটার একটা মরা ডাল পেয়ে গেল। বেশ বড় ডাল, কোনও কারণে গাছ থেকে ভেঙে ঝুলছিল কিন্তু সেটা শুকিয়ে গেছে। টানতে টানতে চালার সামনে নিয়ে আসতে কুসুম বলল, 'কপালে যার লেখা আছে সুখ, তাকে কে দেবে দুখ। তাই তো বলে চিনি জোগান চিন্তামণি। আমি একা হলে ওই ডালটা শুকিয়ে ঝুলত না।'

প্রথমে পাতায় আগুন ধরাল কুসুম। তারপর ছোট ছোট ডালে। এখন বেশ আলো হয়েছে চারধারে। কুপিটাকে নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'দু'রাত তো দেখেছি। ঘুমকাতুরে শব্দটা শুনেছিলাম, সেটা কী জিনিস তা এই বুঝলাম। কিন্তু দু'জনের একসঙ্গে চোখ বোজা চলবে না। প্রথমে আমি জাগছি, ডেকে দিলে যেন চোখ খোলা হয়।'

গগন বলল, 'উলটোটা করলেই ভাল। প্রথমে আমি জাগছি, পরে ডেকে দেব।'

চুপচাপ আগুন দেখছিল ওরা। যত রাত বাড়ছে তত অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হল

জঙ্গলের ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে ব্যাগ থেকে দুটো কলাপাতা বের করে তার ওপর খিচুড়ি আর ডিমের ঝোল ঢেলে কুসুম বলল, 'এগুলোর গতি হোক।'

'তুমি খাবে না?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'বাব্বা। কোনও দিন কোনও ব্যাটাছেলের মুখে একথা শুনিনি।'

'তুমিও নাও। নইলে আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।' গগন বলল।

'না। কোনও দিন যেটা হয়নি আজ ন্যাকামি দেখে করতে পারব না।' কুসুম বলল।

'আমি ন্যাকামি করছি না। তুমি এতক্ষণ যা ইচ্ছে তাই বলে গেছ, আমি কিছু বলিনি। এখন আমি যা বলছি তাই তোমাকে করতে হবে।' গগন বলল।

'উঃ। একটাই তো কলাপাতা, খাওয়া হয়ে গেলে ওটা ধুয়ে তবে তো খাব।'

'আর কলাপাতা পাওনি?'

'যা ছিল সব তো বোম মারিয়েরা খেয়ে শেষ করেছে।'

'বোম মারিয়ে মানে?'

'ওমা! কী ন্যাকা! ওই যারা খিচ্‌ড়ি গিলল, তারা তো বোম মারবে, সবাইকে বোম বানাতে শেখাবে। জানে না যেন!'

গগন জবাব না দিয়ে চটপট খেয়ে নিল। এবার ব্যাগ থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করে দিয়ে কুসুম বলল, 'একা শেষ না করলেই ভাল হয়।'

গগন হেসে ফেলল। অল্প জল খেয়ে বোতলটা ফেরত দিতে সেটা ব্যাগে রেখে আর একটা বোতল বের করে তার জলে এঁটো কলাপাতা ধুয়ে নিল। গগন বড় ডালটার কিছু অংশ আগুনে ফেলে দিল।

খাওয়া শেষ হলে জল খেয়ে কুসুম উঠল। হন হন করে চলে গেল গাছের ওপাশে। গগন পাটির ওপর ফিরে এসে বসতেই দেখতে পেল অন্ধকারে কার চোখ জ্বলছে। দুটো নয়, অনেকগুলো। কুসুম ফিরে আসতেই সে ওকে ইশারায় দেখাল। সেদিকে তাকিয়ে কুসুম চিৎকার করল, 'এই যা, ভাগ! খিচ্‌ড়ির গন্ধে চলে এসেছে।'

'শেয়াল নাকি?' গগন জিজ্ঞাসা করল।'

'বাঘ হলে তো এতক্ষণে হাড় চিবোত।' পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল কুসুম।

গগন একটা পাথর তুলে চোখগুলোর দিকে ছুড়তেই ওরা দুদ্দাড় করে

আমারবই.কম

পালাল। অন্ধকার ক্রমশ হালকা হয়ে আসছিল। কেমন রহস্যময় চার ধার। মাঝে মাঝে ডাল থেকে ভেঙে টুকরো গুঁজে নিচ্ছিল গগন। কুসুম যা বলল তা যদি সত্যি হয় তা হলে তো আজ রাত থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোমা মারিয়েদের কোথায় পেল যতীন? ওরা কেন আসবে? ওদের তো জমি দখল হচ্ছে না। এইরকম যুদ্ধে ওরা জড়াতে চাইবে কেন? এর একটাই উত্তর ওরা টাকার বিনিময়ে এসেছে। আগে হলে খুব খারাপ লাগত গগনের। কিন্তু এখন মনে হল, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ঘুম পাচ্ছিল খুব। এখন রাত ক'টা কে জানে। গগন কুসুমের দিকে তাকাল। একই ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে সে। মেয়েটা অদ্ভুত। একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে চলে এল। কার্তিক যতই বাধ্য করুক ও না চাইলে তো পাঠাতে পারত না। এই নির্জন জঙ্গলে নিশুতি রাতে ও কোন ভরসায় এরকম মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে? গগন যদি বদ লোক হত তা হলে কি ও বাধা দিতে পারত? এত বিশ্বাস ও পেল কোথায়?

হঠাৎ গগন দেখল কুসুম চিৎ হল। ওর শরীরে যেন খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মুখ হাঁ হয়ে গেল, শরীর বেঁকে যাচ্ছে। তারপরই ঝট করে উঠে বসে হাঁটুতে মুখ রাখল। ওর শরীর কাঁপছে এখন। তার পরেই সেই চিৎকারটা গগন শুনতে পেল যা দুটো রাতে মাছের গুদামের ওপরের ঘরে শুয়ে শুনেছিল। গগন অবাক হয়ে দেখছিল, আর্ত চিৎকারটা ক্রমশ কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে দম আটকে মরে যাবে মেয়েটা।

গগন উঠে দাঁড়াল। যেন একটা ভৌতিক দৃশ্য দেখছে সে। সংবিৎ আসতেই প্রচণ্ড ধমক দিল গলা তুলে। কিন্তু সেটা যেন কুসুমের কানে ঢুকল না। উলটে হাত মুঠো করে বুকে ঘুষি মারতে লাগল কান্নার সময়ে। অসহায় গগন চার পাশে তাকাল। লাল চোখগুলো এবার এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে তাদের শরীরের আদল আবছা বোঝা যাচ্ছিল। ঘুমন্ত শিশুকে শেয়াল তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে শুনেছে সে। কিন্তু তাদের দলবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে আক্রমণ করার কথা শোনেনি। গগন লাঠিটা তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাল, 'যা, যা। যা এখান থেকে।' চিৎকার করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সরু গলায় খেঁকিয়ে উঠল কুসুম, 'যা, যা। কেন যাব? এখন আমার সব কিছু কেড়ে ফতুর করে বলছে যা, যা এখান থেকে! হাঁ, যাব। যাওয়ার আগে তোমার বউ-বাচ্চার সামনে গিয়ে বলব, দ্যাখ,

চেয়ে দ্যাখ, এই শরীরটাতে তোদের অন্নদাতা কী বিষ ঢেলেছে। বলেছি বিষ চাই না, অমৃত দাও। শোনেনি। বলেছে লোকে কী বলবে বাচ্চা এলে? লোকলজ্জা! ঝাঁটা মারি তোমার আর ওই লোকের মাথায়।' বলতে বলতে আবার কান্না শুরু হল। ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণতা। গগন এগিয়ে কুসুমের পাশে যেতেই কুসুম চিৎকার করল, 'এসে গেছে, এসে গেছে! বাঃ, ছিবড়ে শরীরের ওপর এখনও লোভ। ঠিক আছে, আমি বাধা দেব না, কিন্তু আমাকে একটা বাচ্চা দাও। বিশ্বাস করো, তোমার বউকে আমি কিছু বলব না। কোনও দিন বলব না।'

হঠাৎ সজোরে চড় মারল গগন। একটু একটু করে তার শরীরে মনে যেগুলো জন্মেছিল সেগুলো একত্রিত হয়ে ক্রোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কখন তা সে নিজেই জানে না। আঘাত পেয়ে ছিটকে গেল কুসুম। পাটির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে অদ্ভুত নিচু স্বরে কাঁদতে লাগল। গগন গর্জন করল, 'আর একটু শব্দ করলে মেরে ফেলব।'

'তাই করো। আমাকে মেরে ফেলো। মেরে ফেলো।' কান্না গিলছিল কুসুম।

গগন কুসুমের থলে থেকে দ্বিতীয় বোতলটা বের করে ওর মুখে মাথায় খানিকটা জল ঢেলে দিতেই কুসুম চিৎকার করল, 'ওরে মারে, মেরে ফেলল, মরে গেলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চড় সজোরে মারল গগন। এবার ওর কাঁধে।

থমকে গেল কুসুম, 'কে এটা? এটা কে?'

'আমি গগন। গোবর্ধন নই।'

অদ্ভুত চোখে তাকাল কুসুম। তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করল। গগন সরে এল। শেয়ালগুলোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে নিভে আসা আগুনে আবার গাছের শুকনো ডাল গুঁজতেই আগুন শিখা তুলল। লাঠি উঁচিয়ে শেয়ালগুলোর দিকে তেড়ে যেতে তারা নিমেষে উধাও হয়ে গেল। গগন বুঝল ওরা একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

মাথার ওপর চাঁদ এসে গিয়েছে। যা ছিল সে-রাতে কুমড়োর ফালির মতো আজ তা নৌকোর আদল নিয়েছে। শেয়ালগুলো আবার এগিয়ে এসেছে। ওদের লাল চোখ এখন অনেক বেশি সাহসী। এই সাহস যদি বেড়ে যায়? হঠাৎ কাণ্ডটা ঘটল। কোথাও আওয়াজ শুরু হতেই শেয়ালগুলো পড়ি কি

আমারবই.কম

মরি করে দৌড়াল উলটো দিকে। গগন আগুনের কাছে চলে আসতে না আসতেই জঙ্গল ভেদ করে একটা প্রাণী দৌড়ে চলে এল গাছের পাশে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় পেল না। তার পেছন পেছন হিংস্র ভঙ্গিতে যেটা ছুটে আসছে তা যে একটা শুয়োর তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। শুয়োরটার মুখের ওপর ধারালো কিছু উঁচিয়ে ছিল। দাঁত না শিং। শুয়োরের শিং থাকে বলে সে কখনও শোনেনি।

তারপর আবার যখন শান্ত হয়ে গেল চরাচর, কিছুক্ষণ বসে থাকল গগন। তার ঘুম উধাও হয়ে গিয়েছে। কুসুম কি ঘুমিয়ে পড়েছে? আবার যদি ওই রকম পাগলামি করে তা হলে সে কী করতে পারে। তখন সে মেরেছিল আচমকাই। এখন খারাপ লাগছে। জীবনে সে কোনও মেয়ের শরীরে আঘাত করেনি। মা বলত যেসব পুরুষ বউ-মেয়েকে মারে তাদের নরকে যেতে হয়। সেখানে আগুনে বসানো কড়াই-এ ফুটন্ত তেল তাদের জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু সে ইচ্ছে করে কুসুমকে মারেনি। না মারলে ওর চেতনা ফেরানো যেত না। কিন্তু এখন খারাপ লাগছে। কুসুম হয়তো বুঝতে পারেনি কে তাকে মারল, কিন্তু না মেরে কার্তিকের মতো সে ওর মুখ চেপে ধরে চিৎকার থামাতে পারত।

কিন্তু গোবর্ধন এটা কী করছে? কুসুম যেন একটা পতিত জমি, কেউ দেখার নেই, কোন মালিকানা নেই, সে ইচ্ছে মতন জমিটাকে ব্যবহার করছে? কুসুম একটা বাচ্চা চেয়েছিল। তিন ফসলি দূরের কথা, এক ফসলির সৌভাগ্য ওকে দিতে সে নারাজ। কোথায় যেন সে পড়েছিল মেয়েরা মাটির মতো। মাটি মানে জমি, যে জমিরক্ষা করার জন্যে মানুষ আন্দোলন শুরু করেছে। কুসুমের পাশে কেউ কেন এসে দাঁড়ায়নি।

রাত বাড়ছে। কুসুম মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। এখন ওকে ডেকে উঠিয়ে দিলে সে বাকি রাতটা ঘুমাতে পারে। কিন্তু ডাকতে গিয়েও থমকে গেল গগন। মেয়েটার ঘুমানোর ভঙ্গি দেখে মনে মায়া এল। বোধহয় রোজ রাতে ও একটা ঘোরের মধ্যে জেগে ওঠে, কাঁদে, গালাগাল দেয়, সেটা শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই খুব কাহিল হয়ে যায় এসময়। এখন ওকে ডেকে তুলে জাগতে বললে হয়তো জাগবে, কিন্তু—! মুখ সরিয়ে নিল গগন।

হঠাৎ ঝপ করে শব্দ হল খড়ের চালে। তারপর সড়সড় শব্দ। গগন লাঠিটাকে শক্ত করে ধরল। চালের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল শব্দটা

কেন হচ্ছে। তারপর চোখ সরাতে তার শরীর হিম হয়ে গেল। কুসুম যেখানে ঘুমিয়ে তার পেছনের বাঁশের খুঁটি বেয়ে নেমে আসছে যে সাপটা তার জিভ লক লক করছে। মুখটা বিরাট, শরীর বেশ শক্তপোক্ত, তেল তেলে। গগন উঠে দাঁড়াতেই সাপটা তার দিকে তাকাল। বাঁশের খুঁটিতে শরীর জড়িয়ে মুখ ওপরে তুলে বীভৎস ভঙ্গিতে হাঁ করে শব্দ বের করল। ক্রমশ শরীরটাকে শূন্যে বের করে আনছিল লেজটাকে খুঁটিতে জড়িয়ে রেখে। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে লাঠি চালাল গগন। মাথা চটপট সরিয়ে নিতেই গগনের লাঠি শূন্যে দাগ কাটল। সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি ছেড়ে লাফিয়ে নীচে নামল সাপটা। তারপর ধীরে ধীরে সোজা হয়ে ফণা তুলল।

সেই ফণার দিকে তাকিয়ে গগনের মনে হল আজ তার শেষ রাত। কুসুম ঘুমাচ্ছে। ওকে ডাকলেই নড়াচড়া করবে। আর নড়তে দেখলেই সাপ ওকেই ছোবল মারবে। গগন ধীরে ধীরে আগুনের কাছে চলে এল। সাপ মুখ ঘুরিয়ে তাকে লক্ষ করছে। এবার মুখ নিচু করে সড়সড় করে গগনের দিকে এগিয়ে আসতে চাইল। শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে লাঠি দিয়ে আঘাত করল গগন। শরীরের সামান্য অংশে স্পর্শ লাগল কিন্তু ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল লাঠিটা। সাপটা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়া লাঠির টুকরোটাকে ছোবল মেরেই বুঝতে পারল বোকামি করেছে। সে আবার মুখ ফেরাতেই গগন জ্বলন্ত গাছের ডাল ওর মুখে চেপে ধরল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ছিটকে গেল সাপটা। তারপর দ্রুত জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। শ্বাস ফেলল গগন। ডালটাকে রেখে দিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর শরীর শান্ত হলে পাটির ওপর গিয়ে বসল। কুসুম ঘুমাচ্ছে। এত যে ঘটনা ঘটে গেল তার কিছুই সে টের পায়নি। না ডেকে ভালই হয়েছে, এই ঘুম ওর দরকার ছিল।

আমারবই.কম

একটু একটু করে অন্ধকার পাতলা হতে হতে আকাশের চেহারা বদলাল। এখন সাদা চোখে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। গোটা রাত না ঘুমিয়ে আলস্য লাগছিল গগনের। কিন্তু আলতায় পৌঁছাতে এলে এখনই হাঁটা শুরু করা উচিত।

গগন ডাকল, 'কুসুম, কুসুম।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কুসুম। অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল। তার মুখে চোখে লজ্জা মেশানো যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল সেটা অপরাধের। মুখ নিচু

করে বলল, 'আমার জন্যে সারা রাত জেগে থাকতে হয়েছে। ছি ছি!' এই গলায় কুসুম কখনও কথা বলেনি।

আবার হাঁটা আরম্ভ হল। যত এগোচ্ছে তত জঙ্গলের চরিত্র বদলে যাচ্ছে। সূর্য যখন কিছুটা ওপরে তখন গগনের খেয়াল হল, এতটা পথ কুসুম কথা বলেনি একটাও।

আরও কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎ মানুষের গলা শুনতে পেয়ে কুসুম দাঁড়িয়ে গেল। কান পেতে কথা শোনার চেষ্টা করল। তারপর হাত ধরে গগনকে টেনে নিয়ে গেল রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের একপাশে। গগন নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

কুসুম ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারা করল কথা না বলতে।

তখনই দলটাকে দেখতে পেল গগন। গোবর্ধনের দল। অন্তত জনা দশেক লোক ওর সঙ্গে। প্রত্যেকের কাঁধে ভারী বস্তা। দু'তিনজন ছাড়া কাউকে চেনে না গগন। ওরা চলে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'গোবর্ধনকে দেখে তুমি লুকোলে কেন?'

কুসুম জবাব দিল না। আবার হাঁটতে শুরু করল।

আলতা নদীর গায়ে ওরা যখন পৌঁছাল তখন বিকেল হতে দেরি আছে। দূর থেকেই খড়ের চালাঘরগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। একটাই ইটের বাড়ি, টালির ছাদ। নদীতে কয়েকটা নৌকো, একটা ট্রলার পাড়ে শক্ত করে বাঁধা। ওদের দেখতে পেয়ে কয়েকজন লোক এগিয়ে এল। তাদের মুখে কৌতূহল স্পষ্ট। কিন্তু কুসুমকে চিনতে পেরে গিয়ে একজন বলল, 'বড়বাবু তো ফিরে গেছেন। দেখা হয়নি।'

কুসুম বেমালুম মিথ্যে বলল, 'না।'

'এঃ হে হে! ওই ট্রলারে করে লোক নিয়ে এসেছিলেন ওপার থেকে। ভারী ভারী বস্তা নিয়ে ওরা বড়বাবুর সঙ্গে চলে গেল।' লোকটা জানাল।

একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। দোকানে মালপত্র কিছুই নেই। বেঞ্চিতে বসল ওরা। কুসুম দোকানদারকে বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে।'

'ডিম ভাজা করে দিতে পারি।' দোকানদার বলল।

'তাই দিন।' তারপর গগনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় জানতে চাইল, 'টাকা আছে?'

'আছে।' গগন আশ্বস্ত করল।

এক বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কে হন মা?'

কুসুম হাসল, 'এঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

গগন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখানে একটা জরুরি কাজে আমাকে আসতে হয়েছে। ও পথটা চেনে বলে সঙ্গে এসেছে।'

ভিড়টা ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল। ডিমভাজা তবু খাওয়া যায় কিন্তু গগনের মনে হল এত কুৎসিত চা সে জীবনে খায়নি। কুসুম কিন্তু চা খেল না। পেট পুরে জল খেল সে। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি নদীর জল?'

'না বাবু। টিউওয়েল থেকে তোলা জল।'

কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'রাত্রে কোথায় থাকা যায় বলুন তো?'

'বাবুর ঘরের দরজায় তালা পড়ে গেছে। চাবি তো উনি নিয়ে গেছেন।

'ও। আমরা অবশ্য এই বেঞ্চিতেও রাত কাটাতে পারি।'

'না না। দাঁড়ান। দেখছি। রাত্রে কী খাবেন?'

'যা দেবেন।'

'মাছের তরকারি আর ভাত করে দিতে পারি।'

'বাঃ। চমৎকার। কত দিতে হবে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'আচ্ছা চল্লিশ টাকা দিলে ভাল হয়।'

পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ঝোলা থেকে বের করে চাওয়ালাকে দিল গগন।

এখানে সন্ধের অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই লোকে রাত্রের খাওয়া সেরে নেয়। যেসব নৌকো মাছ ধরতে গিয়েছিল, তারা মাছ নিয়ে চলে গেছে দূরের কোনও আড়তদারদের ডেরায়। নদী এখন বেশ শান্ত। এতটাই চওড়া যে কূল দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্র বলে মনে হয়। এই নদীর নাম কে আলতা রেখেছিল কে জানে।

'আচ্ছা, আপনার ওই বেঞ্চিতে ঘুমাতে অসুবিধে হবে?' কুসুম বলল।

'বিন্দুমাত্র না।'

'তা হলে এখানেই থাকব আমরা। খড়ের ঘরগুলোতে ওরা মাটিতে শোয়। আমাদের জন্যে কেউ হয়ত ঘর ছেড়ে দেবে। আমার ভাল লাগবে না।' কুসুম বলল।

সন্ধের আগে থেকেই মাতলামি শুরু হয়ে গিয়েছিল। চোলাই মদ পেট ভরে খেয়ে হল্লা করল লোকগুলো। তারপর সব শান্ত। ভাত মাছ খাওয়ার

আমারবই.কম

পর চাওয়ালাকে বুঝিয়ে ওরা দোকানেই থেকে গেল। চাওয়ালা বলে গেল, 'সাবধানে ঘুমাবেন। মাঝেমাঝে কুমির উঠে আসে নদী থেকে। তবে এদিকে বাঘের ভয় নেই।'

বেঞ্চিতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল গগন। দ্বিতীয় বেঞ্চিতে কুসুম। শোওয়ামাত্র ঘুম এসে গেল গগনের।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারপাশে ঘন অন্ধকার। আকাশে চাঁদ। ওদিকের বেঞ্চিতে কুসুম ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। গগন অবাক হল। আজ রাত্রে কুসুম তো চিৎকার বা কান্না কিছুই করছে না। সকাল থেকে ওর ধরনটা অন্যরকম ছিল। একটাও বেঁকানো কথা বলেনি। গগন আবার চোখ বন্ধ করল।

'উঠুন উঠুন।' কুসুমের ডাকে তাকাল গগন। কুসুম বলল, 'দুটো ভটভটি আসছে এদিকে। আওয়াজ পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।' উঠে পড়ল গগন। তারপর কী মনে হতে বলল, 'তুমি এখানেই থাক।'

ঝোলা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। আকাশে শুকতারা, চাঁদ ঢলেছে। নৌকোদুটোকে স্পষ্ট দেখতে পেল। তীরের কাছাকাছি এসে নৌকো থেকে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল কিছু লোক। দশজন। গগন গুনল। যতীন যে সংখ্যা বলেছিল তা থেকে অনেক কম। সে এগিয়ে যেতে একজন বয়স্ক পাকা দাড়িওয়ালা মানুষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয়?'

'আমি শিবচরণপুর থেকে এসেছি। যতীন পাঠিয়েছে।' গগন জবাব দিল।

'এরা কেউ বাংলা বলতে পারে না তবে বোঝে। কিছু এনেছেন?'

'হ্যাঁ।' প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দিল গগন, 'যতীন এটা দিতে বলেছেন।'

'কত আছে?'

'আমি জানি না।'

'আশা করি কথার খেলাপ করেনি। করলে কালই ওরা ফেরত আসবে। নিয়ে যান ওদের।' তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'মালেক!'

একটা শক্তপোক্ত লোক এগিয়ে এল, 'জি।'

'এর নাম মালেক। এদের নেতা। মালেক, এ তোমাদের শিবচরণপুরে নিয়ে যাবে। যা বলেছি সেই মতো কাজ করবে। ওয়াকিটকি সব সময় খোলা রাখবে।'

'জি!'

গগন দেখল এরা কাঠের বাক্স নামাচ্ছে নৌকো থেকে। নয়জন লোক সেই বাক্স মাথার ওপরে তুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হল। গগন বলল মালেককে, 'এই রাস্তা, সোজা। আমি পেছনে আসছি।'

ওরা রওনা হতেই বৃদ্ধ উঠে গেল নৌকোয়। ভটভটি নৌকো চলে গেল আলতা নদীর ভেতরে। কুসুম সম্ভবত দোকানে বসে সব লক্ষ করছিল। এবার ছুটে এল পাশে, 'ওরাও যুদ্ধ করতে এসেছে?'

গগন অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'হুঁ।'

লোকগুলো রাস্তায় থামতে চাইল না। ফলে গোবর্ধনের মাছের গুদামে যখন ওরা পৌঁছল তখন মধ্যরাত। গগন আর হাঁটতে পারছিল না। কাহিল হয়ে পড়েছিল কুসুম। ডাকাডাকিতে দরজা খুলে দিল কার্তিক। বাড়ি এখন খালি। গুদামঘরে ঢুকে গেল নয়জন মানুষ।

কলতলায় গিয়ে মুখে শরীরে জল দিয়ে একটু স্বস্তি হল গগনের। কার্তিক এসে বলল, 'বড়বাবু বলেছিলেন এরা কাল আসবে। এই রাত্রে খাবার দিই কী করে?'

'কিছু নেই?'

'চিড়ে আর গুড় আছে।'

'তাই দিয়ে দাও। ওপরের ঘরের দরজা খোলা আছে?'

'হ্যাঁ।'

গগন দাঁড়াল না। সোজা ওপরের ঘরে ঢুকে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। আর তখনই বোমার শব্দ হল। বেশ জোরে ফাটল পর পর কয়েকটা। মনে হল বেশি দূরে ঘটনাটা ঘটছে না।

কার্তিক চলে এল দরজায়, 'এই লোকগুলো সুবিধের নয়। মেয়েটাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দেব? মেঝেতে শুয়ে থাকবে। যদি চিৎকার করে মুখ চেপে ধরবেন।'

'আমিই যে সুবিধের লোক তা ভাবলে কী করে?'

'দেড় রাত তো একসঙ্গে ছিলেন। তেমন হলে মেয়ে এখানে এসে শুতে রাজি হত না। আপনি নাকি ওকে পেছন পেছন আসতে বলেছিলেন যাতে ওরা ওকে দেখতে না পায়।' কার্তিক বলল।

আমারবই.কম

'ঠিক আছে। আমি ঘুমাচ্ছি।'

'না না। কুসুম আপনার জন্যে রাঁধছে। ভাতে ভাত। এখনই হয়ে যাবে।'

'এত কষ্টের পর মেয়েটা রাঁধছে?' অবাক হয়ে বলল গগন।

কার্তিক বলল, 'আগে হলে কিছুতেই রাজি হত না। হঠাৎ যে কী হয়েছে—।'

এই সময় আবার পর পর বোমা ফাটার শব্দ হল। কার্তিক বলল, 'বাপ রে বাপ।'

গগন উঠে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

'আপনি যাদের দেখে গিয়েছিলেন তারা মাঠে নামতেই সমানে সমানে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাঙা সাঁকো আবার দখল করে নিয়েছে জমি রক্ষা পার্টি। এখন বিজুরির দিক থেকে বোমা-গুলি যেমন ছুটে আসছে তেমনি এদিক থেকেও যাচ্ছে। এখানেও যেমন বাইরের লোক এসেছে তেমনি বিজুরিতেও শুনলাম প্রচুর নতুন মুখ জড়ো হয়েছে। বাবু, এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে?'

কার্তিকের প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়ল গগন। যুদ্ধ না হলে জমি বাঁচানো যাবে না কিন্তু এই যুদ্ধ কখন কীভাবে শেষ হবে তা নিয়ে কি কেউ ভেবেছে?

সে জিজ্ঞাসা করল, 'সেদিন আলতায় যাওয়ার আগে যাদের দেখে গেলাম এখানে তাদের তুমি চেনো?'

'চিনি না। তবে পুব দিকের মাঠ পেরিয়ে এসেছিল বিরোধী দলের লোকজন। ওই কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবারে থাকে। যতীনবাবুর চেনা। তাঁর ডাকে এসেছিল।' বলেই গলা নামাল, 'আপনি যাদের নিয়ে এলেন তারা তো বাংলা জানে না। ভাবভঙ্গিও খুব ভয়ংকর। এদের কোথায় পেলেন বাবু?'

'যতীন যেখানে যেতে বলেছিল সেখানে গিয়ে পেয়েছি। তোমার বড়বাবু তো আমাদের আগেই ফিরে এসেছে। কী নিয়ে এল সে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

'আমি বলব না বাবু। মুখ খুললেই চাকরি যাবে।' কার্তিক উঠল।

আবার শুয়ে পড়ল গগন। এখন শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। তবু একটা সাইকেলের পেছনে সে উঠে বসতে পারত বাড়িতে পৌঁছনোর জন্যে। হেঁটে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

কার্তিক আবার এল এক থালা ফ্যানা ভাত আর ডিম আলু সেদ্ধ নিয়ে। খুব একটা ইচ্ছে হচ্ছিল না তবু খেয়ে নিল গগন। কার্তিক বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ুন

বাবু। কুসুম একটু পরে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়বে। খুব ভয় পেয়ে গেছে ওই লোকদের দেখে।'

ক্লান্ত শরীরে গরম ভাত খাওয়ায় ঘুম এসে গেল চট করে। ভোরের দিকে সে একটু দুঃস্বপ্ন দেখল। কালো পোশাক পরা কিছু লোক আধুনিক অস্ত্র নিয়ে গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যাকে পাচ্ছে তাকে হত্যা করছে। চোখের সামনে ছোট ভাই গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে মায়ের শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতেই চিৎকার করে ছুটে গেল গগন। তখনই কুসুমের চাপা গলা সে দূর থেকে শুনতে পেল, 'কী হল? অমন করছেন কেন? চোখ মেলুন।'

হঠাৎ যেন ভুল করে গভীর জলের নীচ থেকে ওপরে উঠে শ্বাস নিল গগন, 'আমার মা ভাইকে ওরা মেরে ফেলেছে। ওহ।'

'কেউ মারা যায়নি। আপনাকে বোবায় পেয়েছিল। আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন।'

পরম স্নেহে গগনের মাথায় কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল কুসুম।

চেতনা স্পষ্ট হওয়ার সময় নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হতেই শুয়ে থেকেই দু' হাতে কুসুমকে জড়িয়ে ধরল গগন। সেই টানে তার বুকে মাথা রাখতে হল কুসুমকে। তার কানে গগনের হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুততা ধরা পড়তেই সে সহজ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে গগন বলল, 'কিছু মনে কোরো না।'

'না।'

'তুমি আজ রাত্রে তো কাঁদোনি! চিৎকারও করোনি।'

কুসুম উঠে দাঁড়াল, 'আপনি ঘুমান। এখনও রাত বাকি আছে।' বলে সে চলে গেল তার শোওয়ার জায়গায়। মেঝের ওপর।

কিন্তু গগনের আর ঘুম আসছিল না।

আমারবই.কম

জমি রক্ষা কমিটির মিটিং হচ্ছিল। যদিও গগন এবং বন্যা কমিটির সদস্য নয়, তবু তাদের ডেকে আনা হয়েছিল। প্রথমে যতীন গোবর্ধন এবং গগনকে ধন্যবাদ দিল। সহযোগিতার জন্যে। তারপর এম এল এ কথা বললেন, 'যুদ্ধ

অসম হয়ে যাচ্ছিল, হার অবধারিত ছিল। বাইরের বন্ধুদের সাহায্য নিতে বাধ্য হলাম আমরা। ইতিমধ্যে কলকাতার টিভি খবরের কাগজ এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। তারা বলছে আমরা কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের লড়াই-এর জন্যে ডেকে এনেছি। আমি পরিষ্কার করে বলছি, শিবচরণপুর বা বেন্ধেমারিতে কোনও কুখ্যাত বা অখ্যাত সমাজবিরোধী নেই।

'গতকালও সরকার বলেছেন ন্যায্য দাম দিয়ে এক ফসলি জমি শিল্পের জন্যে গ্রহণ করবেন। গ্রহণ করে তাঁরা বিদেশি বা দিশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবেন যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের কোনও চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমাদের প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার একর জমি আছে যেখানে একটিও লাঙল পড়ে না। কোনও দিন সেখানে চাষবাস হয় না। উত্তরবঙ্গে এরকম ছবি প্রচুর আছে। সরকার সেখানে শিল্পপতিদের কারখানা তৈরি করতে বলছেন না কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে না। যাবে না বলেই আমরা প্রাণ দেব কিন্তু জমি দেব না।'

'আমরা বিরোধী পার্টির আক্রমণ রুখে দিয়েছি। সরকার এবার অনেক বেশি পুলিশ, সি আর পি অথবা মিলিটারি নামিয়ে আমাদের গ্রাম দখল করতে পারে। বন্ধুগণ, যাই হোক না কেন, জান কবুল জমি দেব না।'

হাততালি দিল সবাই।

যতীন এবং এম এল এ বন্যাকে ডেকে নিল আলাদা আলোচনা করতে। গোবর্ধন, গৌরাঙ্গ গগনকে নিয়ে বসল কয়েকটা কমিটি তৈরি করতে। একটা কমিটি আলতা হয়ে আসা স্বেচ্ছাসেবীদের দেখাশোনা করবে। আর একটা কমিটি ডায়মন্ডহারবার কাকদ্বীপ থেকে আসা বিরোধী দলের সদস্যদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবে। যারা চাঁদা তুলছিল তাদের বলা হল সরকারি পার্টির যেসব সমর্থক এখনও গ্রামে আছে অথবা তারা পালিয়ে গেলেও মহিলা ও শিশুদের রেখে গেছে তাদের কাছে মোটা টাকা চাঁদা তুলতে হবে। এত দিন সরকারি পার্টি করে এরা প্রচুর সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে। শুনে গগন হাসল, 'সবাই নয়। কেউ কেউ একটা পয়সাও পার্টির কাছ থেকে নেয়নি। চাঁদা তোলার সময় কথাটা যেন মনে রাখা হয়।'

গোবর্ধন হাসল, 'যেমন তুমি। গগনের বাড়িতে যেন ভুল করে চাঁদা তুলতে যেয়ো না।'

বাড়ি ফেরার পথে মদনের সঙ্গে দেখা। একটা আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। গগন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সিগারেট খাচ্ছ?'

'কী করব? দিলে ফেলে দেব?'

'কে দিল?'

'নাম বলব কেন? তবে সে বিজুরির লোক।'

'বিজুরির লোকের দেখা পেলে কোথায়?'

'কী বোকার মতো কথা। লিচুগাছ বা কাঁঠাল গাছে তো আম পাওয়া যায় না, পেতে গেলে আমগাছেই তো পাওয়া যায়।' খেঁকিয়ে উঠল মদন।

'তুমি বিজুরিতে গিয়েছিলে?' অবাক হয়ে গেল গগন।

'নিশ্চয়ই।'

'কী করে গেলে? এই যে এত বোমাবাজি হচ্ছে।'

'ঠিক সূর্য ওঠার আগে সব শান্ত হয়ে থাকে। তখন গেলাম।'

'ওখানে গিয়ে কী দেখলে?'

'দশ টাকা ধার দাও।'

'মানে?'

'মাগনা মাগনা খবর দেব কেন? বিকাশ ধার দিল আমি খবর দিলাম।' বলে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল মদন।

লোকটার সাহস দেখে মাথা গরম হয়ে গেল গগনের, 'কী খবর দিলে?'

'দশ টাকা ধার দাও, বলছি।'

'গ্রামের লোক জানলে তোমার কী অবস্থা হবে জানো?'

'আশ্চর্য! খারাপ অবস্থা হবে কেন? আমাকে দশ টাকা ধার দিলে আমি বিজুরিতে গিয়ে খবর এনে দেব যা তোমরা এখানে বসে পাবে না। আমি তো উপকারই করব।'

মদনকে ছেড়ে হাঁটতে লাগল গগন।

সারা দিন ধরে বোমাবাজি চলল। কিন্তু সন্ধের অন্ধকার নামতেই শিবচরণপুর এবং বেন্ধেমারি থেকে একই সঙ্গে বিজুরির ওপর আক্রমণ শুরু হল। শিবচরণপুরের লোক বিজুরিতে গিয়ে তিন জনকে খুন করল, চারটে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ভক্তহাট থেকে সেখানে একটা পুলিশ চৌকি করা হয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে তারা কাল লড়াই করতে পারেনি। বোমার

আমারবই.কম

বদলে গ্রেনেড ছুড়ে ওরা ফিরে যাওয়ার সময় একজন পুলিশকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল।

জেলাশাসক পুলিশ সুপারকে নিয়ে মিটিং-এ বসলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। যেমন করেই হোক শিবচরণপুর থেকে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। গোরা দত্ত ছুটে গেল সাংসদের কাছে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে জেলাশাসককে নির্দেশ দিলেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিবচরণপুর দখল করুন।

পরের দিন সকালে যখন পুলিশকর্মীর মৃতদেহ খালের ধারে পাওয়া গেল তখন উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। খবর এল বিশাল পুলিশ বাহিনী এগিয়ে আসছে শিবচরণপুরের দিকে।

শিবচরণপুরে ঢোকার রাস্তা চারটে। প্রতিটি রাস্তাই কেটে রাখা হয়েছে। গাড়ি ছেড়ে শ'দেড়েক পুলিশ মার্চ করতে করতে ঢুকল গর্ত ডিঙিয়ে। গ্রামে ঢোকার মুখে একটা বটগাছের নীচে তখন শনিঠাকুরের পুজো করছে কয়েকজন মেয়ে। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে অনেক মেয়ে। ছেলেরা ধারেকাছে নেই।

পুলিশের দল থমকে গেল। এগোতে গেলে মেয়েদের রাস্তা থেকে সরাতে হয়। একজন অফিসার হ্যান্ড স্পিকারে সেই আবেদন জানালেন কয়েকবার কিন্তু কোনও কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ল পুলিশ। সেই সঙ্গে পুলিশের মাথা ডিঙিয়ে পরপর পাঁচটা বোমা উড়ে এল পেছন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা খেপে গেল। কাঁদুনে গ্যাসের শেল তুলে তারা ছুড়তে লাগল পুলিশের দিকে। কাটারি, দা, বটি তুলে নিল লুকনো জায়গা থেকে। তারপর মার মার রব তুলে তারা তেড়ে গেল পুলিশদের দিকে।

লাঠি দিয়ে না আটকে পুলিশ গুলি চালাল। পেটে বুকে মাথায় গুলি লাগামাত্র মেয়েগুলো পড়ে যেতে লাগল মাটির ওপর। পুলিশ এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি মেয়েদের ওপর। বিবস্ত্র করে কয়েকটি মেয়েকে টেনে নিয়ে গেল রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে। অফিসাররা পুলিশদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটার নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতে ছিল না। এই সময় শিবচরণপুরের ভেতর থেকে শক্তিশালী গ্রেনেড উড়ে আসতে থাকায় পুলিশ পিছু হটল। পুরো দলটাকে তাড়া করে গ্রেনেড বাহিনী গ্রামের বাইরে বের করে দিল।

পুলিশের গুলিতে মেয়েরা মৃত, মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছে—এই খবরে প্রতিটি টিভি চ্যানেল উত্তাল। গুলি চালানো হয়েছিল কার নির্দেশে। যদি চালাতে বলা হয় তা হলে পায়ের দিকে গুলি না চালিয়ে পেট-বুক-মাথা লক্ষ করে চালানো হল কেন? পুলিশের সঙ্গে এমন অনেকে মিশে ছিল যারা কখনওই পুলিশে চাকরি করে না। এরা কারা?

শিবচরণপুরের ঘরে ঘরে তখন কান্নার শব্দ। জমি রক্ষা কমিটি মিডিয়ার লোকদের গ্রামে ঢোকার অনুমতি দিলে তারা মৃতদেহের ছবি, প্রত্যক্ষদর্শীর ইন্টারভিউ সরাসরি টিভিতে দেখাতে লাগল। মানুষ ভয় পায়নি কিন্তু রাগে ফুঁসছে। যার বাড়ির মেয়ে মারা গেল তার পাশে দাঁড়িয়েছে সবাই।

মৃতদেহগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল গ্রামের ভেতরে। ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্যে ভক্তহাটে পাঠানো দরকার। এম এল এ-র অনুরোধে ভাঙা সাঁকোর ওপারে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। চারটে মেয়েকে কোলে তুলে যখন ছেলেরা অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন গগনের চোখ পড়ল কুসুমের ওপর। নেতিয়ে পড়ে আছে সে। জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন। কখন এল মেয়েটা? কখন এগিয়ে গেল পুলিশদের সামনে? সে ছুটে গেল গোবর্ধনের কাছে, 'কুসুমকে ওরা রেপ করেছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'আমাদের পক্ষে হাসপাতালে যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে গগন।' গোবর্ধন বলল।

'কুসুম সম্পর্কে তোমার কোনও অনুভূতি নেই?'

'আজ যারা মারা গেছে, রেপড্ হয়েছে, তাদের সবার সম্পর্কে আমার একই অনুভূতি।' তারপর গগনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি কিছু জেনে থাক তা সঠিক নাও হতে পারে। অতএব এ নিয়ে কথা না বলাই উচিত।'

চারধারে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। মৃতদেহগুলোর সৎকার গ্রামের শ্মশানে করতে উদ্যোগী হয়েছিল সবাই কিন্তু এম এল এ আপত্তি জানালেন। যারা আজ শহিদ হল তাদের আত্মদান বৃথা হয়ে যাবে যদি সরকারিভাবে ওদের মৃত্যু স্বীকৃত না হয়। তা ছাড়া ওরা যে পুলিশ অথবা তাদের সঙ্গে আসা গুন্ডাদের গুলিতে নিহত হয়েছে এ-কথা যদি সরকার মানতে না চায় তা হলে তার বিপক্ষে প্রমাণ রাখা যাবে না। অতএব মৃতদেহগুলোকে পোস্টমর্টেম করানো অত্যন্ত জরুরি। সৎকার এখানেই করে ফেললে ওদের ডেথ সার্টিফিকেট

পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যতে সরকারের কাছ থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ দাবি করাও সম্ভব হবে না।

এই যুক্তিযুক্ত কথাগুলো যতীন, গোবর্ধন এবং গগন সাধারণ মানুষকে বোঝালে তারা আবেগ কাটিয়ে উঠল। এম এল এ মোবাইলে জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। প্রথমে পুলিশের এই হত্যালীলার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। জেলাশাসক দুঃখপ্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, পুলিশের ভ্যান নয়, সাধারণ ট্রাক পাঠাচ্ছেন জেলাশাসক। তাতে নিহত মহিলাদের দেহ নিয়ে একজন করে আত্মীয় যেন ভক্তহাটে চলে আসেন। সেখান থেকে পোস্টমর্টেমের জন্য সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। পথে কেউ বাধা দেবে না বলে তিনি আশ্বাস দিলেন।

শিবচরণপুর, বেদ্ধেমারির যেসব বাড়িতে টিভি ছিল সেগুলোর সামনে জমাট ভিড়। গোটা পৃথিবী শুনছে এবং দেখছে কীভাবে পুলিশ নিরীহ নিরস্ত্র মেয়েদের ওপর গুলি চালিয়েছে। কলকাতায় বিদ্বজ্জনেরা ধিক্কার জানিয়েছেন। অবিলম্বে দোষী পুলিশ এবং তাদের ওপরওয়ালার শাস্তি দাবি করা হচ্ছে।

একই খবর ক্রমাগত দেখিয়ে যাচ্ছিল বিভিন্ন চ্যানেলে।

সন্ধে নামছে। মৃত মেয়েদের বাড়িগুলোয় তখনও কান্না থামেনি। গগন লক্ষ করেছিল, এত কিছু ঘটে গেল কিন্তু কার্তিক একবারও আসেনি। কুসুমের খবর সে পায়নি এমনটা হতে পারে না। কিন্তু শেষতক মনে হতে লাগল অত দূরে খবরটা পৌঁছে দেবে কে?

সবাই তো এখানে জড়ো হয়ে আছে। একটা সাইকেল জোগাড় করে সে পৌঁছে গেল গোবর্ধনের মাছের গুদামে। গুদাম খালি। আমন্ত্রিত সৈনিকরা এই মুহূর্তে কোথায় আছে কে জানে। সে গুদামের পেছনে চলে এল। আধা অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে কার্তিক। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কার্তিক মুখ তুলছে না দেখে গগন ডাকল, 'কার্তিক!'

কার্তিক জবাব দিল না। কিন্তু গগন বুঝতে পারল কার্তিক খবরটা পেয়ে গেছে।

'তুমি একবার গেলে না কেন কার্তিক!'

'কী হত গিয়ে!' কার্তিক নিচুগলায় বলল।

'কী বলছ তুমি। মেয়ের বিপদের সময় তুমি পাশে দাঁড়াবে না?'

'কোনও দিন তো দাঁড়াতে পারিনি বাবু! আজ নতুন করে কীভাবে দাঁড়াব!'

'কী বলছ কার্তিক?'

'সত্য বলছি বাবু। দিনের পর দিন একটা মানুষ যা করে গেছে আজ কয়েকটা পুলিশ তাই করেছে। পেটের দায়ে আগে মুখ বুজে থেকেছি, আজ প্রাণের ভয়ে তাই করলাম।' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল কার্তিক।

হঠাৎ গগনের শরীরে কাঁটা ফুটে উঠল। সমস্ত রোমকূপে যেন বরফের স্পর্শ। অন্যরকম একটা শীত তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি এনে দিল। দ্রুত সরে এল সে। সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিতে লাগল জোরে জোরে। কার্তিকের কাছ থেকে পালাতে চাইল গগন। গ্রামে ঢোকার পর শীতভাবটা চলে গেল তার। না। পুলিশগুলোর যদি শাস্তি চাওয়া হয়ে থাকে তা হলে গোবর্ধনেরও শাস্তি হওয়া উচিত।

কিন্তু কে দেবে ওকে শাস্তি। জমি রক্ষা কমিটিকে গোবর্ধন প্রচুর সাহায্য করছে। প্রয়োজনে অর্থ দিচ্ছে। এই গ্রামের জমি রক্ষা করার জন্যে তার এই সহযোগিতা মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখছে। এখন শাস্তির কথা বললে কেউ শুনতে চাইবে না।

গগন অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে গোবর্ধনের বাড়িতে গেল। বাড়ির সামনে কিছু স্বেচ্ছাসেবকের ভিড়, কিন্তু গোবর্ধন নেই। জিজ্ঞাসা করতে শুনল, 'দাদা আন্দোলনের কাজে গেছেন।'

এই সময় গোবর্ধনের স্ত্রী বেরিয়ে এল, 'আসুন, আপনি তো এদিকে আসেনই না।'

মহিলার দিকে তাকাল গগন। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'আমি তো কলকাতায় বেশির ভাগ সময় থাকি, তাই—। আচ্ছা চলি।'

বেরিয়ে এসে হঠাৎ হেসে ফেলল গগন, ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু বলতে পারল না সে। বললে গোবর্ধনের বদলে ওর স্ত্রী বেশি শাস্তি পেত মনের শান্তি হারিয়ে।

এখন চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেরা পালা করে পাহারা দিচ্ছে গ্রামে ঢোকার সব কটা পথে। এমনকী মিডিয়ার লোকদেরও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না আজ। সাইকেল চালাচ্ছিল গগন। হঠাৎ ভয়ংকর শব্দে কেঁপে উঠে দাঁড়িয়ে গেল সে। বিজুরির দিক থেকে যে আওয়াজ একটানা ভেসে আসছে তা কিছুতেই

আমারবই.কম

বোমার নয়। তারপরই পুব দিকের মাঠে সেই একই রকম শব্দ হল। সেই সঙ্গে বন্দুকের গুলির আওয়াজ। আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণ চলছে সমানে।

এখন পুলিশের পক্ষে গ্রামে চট করে ঢোকা সম্ভব নয়। সরকারি পার্টির সমর্থকরা ঢুকতে গেলেই বাধা পাবে, মারা যাবে, তাই জমি রক্ষা কমিটির নেতারা বেশ স্বস্তিতে। স্কুলের মাঠে পৌঁছেই ওদের দেখতে পেল গগন। ভেতর থেকে লাইন টেনে এনে টিভি দেখছে সবাই। একটি চ্যানেলের প্রতিবেদক বেশ নাটকীয় গলায় বললেন, 'আমরা চেষ্টা করেও শিবচরণপুর অথবা বেঙ্কেমারিতে ঢুকতে পারছি না। আধুনিক অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে ওখানে। পুলিশের নির্মম হত্যাকাণ্ড যেন মানুষকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছে। জেলা পুলিশের প্রধান স্বীকার করেছেন যে পুলিশের গুলিতে মহিলাদের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাঁর কাছে ধর্ষণ সংক্রান্ত কোনও খবর নেই।' প্রতিবেদক কথাগুলো বলামাত্র সবাই চিৎকার করে গালাগাল দিতে লাগল প্রকৃত সত্যি চেপে দেওয়ার জন্যে। যে মহিলা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছিলেন, 'শুভ্র, তুমি লাইনে থেকো, আমরা তোমার কাছে আবার ফিরে যাব, এই মুহূর্তে পার্টির অন্যতম নেতা আমাদের সঙ্গে আছেন। নমস্কার। আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ শিবচরণপুরে পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন মহিলা মারা গিয়েছেন, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য শোনার জন্যে আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি।'

পার্টির নেতার ছবি পর্দায় এল, 'যে-কোনও মৃত্যু দুঃখজনক ঘটনা। অকালে গুলিতে কেউ নিহত হয়েছেন এটা খুবই বেদনাজনক ব্যাপার। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন জেলা থেকে। নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। মৃত মহিলাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি কয়েকটা ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা জানি শিবচরণপুর, বেঙ্কেমারি, রানিচকে শান্তিপ্রিয় মানুষ বাস করেন। কোনও অপপ্রচারের কারণে তাঁরা ক্ষিপ্ত হতেই পারেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে তাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে গেলেন না কেন? আমরা জানি প্রথমে বোমা এবং বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহার ওখানে হয়েছে। এগুলো তাঁরা কোথায় পেলেন? তারপর ব্যবহার করা হচ্ছে শক্তিশালী গ্রেনেড এবং আধুনিক অস্ত্র। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষ এই সব অস্ত্র ব্যবহার করার শিক্ষা পাওয়া দূরের কথা ওগুলোকে কখনও চোখেও দেখেনি। তা হলে

এই সব অস্ত্রের ব্যবহার কী করে সম্ভব হচ্ছে? আপনারা টিভি চ্যানেলে দেখেছেন যারা অস্ত্র ছুড়ছে তারা তাদের মুখ ঢেকে রেখেছে কাপড়ে অথবা গামছায়। মিডিয়া তো বটেই, গ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছেও তারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি ঝাড়খণ্ড এবং বিহার থেকে মাওবাদীরা এই গ্রামগুলোতে চলে এসেছে। এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে সাহায্যের লোভ দেখিয়ে গ্রামগুলোকে দখল করে নিয়েছে। এদের উৎখাত করতে সরকারের কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু তাতে সাধারণ কিছু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। আমি গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন করছি হিংসার পথ ত্যাগ করুন। দেশের স্বার্থে শান্তির স্বার্থে, এই বহিরাগতদের বয়কট করুন। নমস্কার।'

সঞ্চালিকা চলে এলেন পর্দায়, 'আমরা পার্টির নেতার আবেদন শুনলাম', আমাদের প্রতিনিধি শুভ্র এখন আছে বেঙ্কেমারির কাছে। শুভ্র তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। সরকারি পার্টির নেতা পরিষ্কার দাবি করলেন এই সব গ্রামে শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মাওবাদীরা ঢুকে পড়েছে। এ-ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে?'

প্রতিবেদকের গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ। পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদেরও একই ধারণা। অবশ্য বহিরাগতরা যে মাওবাদী তার প্রমাণ এখনও পাইনি।'

সঞ্চালিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সরকারি পার্টির সমর্থকদের দুর্গ হল বিজুরি। সেখান থেকে সমানে আক্রমণের মোকাবিলা করা হচ্ছে। আমরা আগেও দেখেছি তারা বোমা এবং গুলির সাহায্যে ভাঙা সাঁকো দখল করেছিল। তা তারাও তো শান্তিপ্রিয় মানুষ। তা হলে এই সব অস্ত্র পেলেন কী করে?'

প্রতিবেদক বললেন, 'আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছে আত্মরক্ষার জন্যে, কালীপুজোর জন্যে যেসব পটকা বানানো হয় তার মশলা জোগাড় করে ওঁরা অস্ত্র বানিয়েছেন।

সঞ্চালিকা মাথা নাড়লেন, 'তোমাকে শেষ প্রশ্ন, যদি মাওবাদীরা গ্রামে ঢুকে থাকে তা হলে তারা কোন পথ দিয়ে ঢুকল? পুলিশ জানতে পারল না?'

আমারবই.কম

প্রতিবেদকের গলা শোনা গেল, 'তুমি ঠিকই বলেছ! যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তা অবশ্যই বাইরে থেকে গ্রামে গিয়েছে। কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে অস্ত্র সংগ্রহ করার কথা যে ভাবা হয়নি এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই, আমি এলাকা ঘুরে জেনেছি আন্দোলন শুরু হওয়ার মুখে কিছু সরকার বিরোধী দলের সমর্থক পুব দিকের মাঠ পেরিয়ে গ্রামগুলোতে ঢুকতে পারে। কিন্তু তাদের কাছে কোনও আধুনিক অস্ত্র থাকা সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে পুলিশ কড়া নজর রাখায় ওই পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন মাওবাদীরা যদি ওখানে সক্রিয় হয়ে থাকে তা হলে তারা কীভাবে পৌঁছল তার হদিস কেউ দিতে পারছেন না।'

সঞ্চালিকা ফিরে এলেন পর্দায়, 'একটু আগে আবার বিজুরির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন সরকারি পার্টি। বিজুরির শরণার্থী শিবিরে ঘরছাড়া মানুষেরা আতঙ্কে আশ্রয় নিয়েছেন। জমি রক্ষা কমিটির সমর্থকদের জন্যে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে বেঙ্কেমারি এবং রানিচকে। সেখানেও গৃহত্যাগ করে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষের ঢল নেমেছে। রাজ্য প্রশাসন এ-ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন।'

কথাগুলো বলেই সঞ্চালিকার অভিব্যক্তির বদল হল, কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠল, 'এই মুহূর্তে আমরা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জরুরি সাংবাদিক সম্মেলন করছেন।'

পর্দায় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'শিবচরণপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন মহিলার প্রাণহানি ঘটেছে। এই মৃত্যু কাম্য ছিল না। আমি অত্যন্ত ব্যথিত। মৃত মহিলাদের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁদের আত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আমরা চিন্তা করছি। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শিগগির শুরু হবে। আমি পুলিশকে বলেছি আরও সংযত হতে।'

কোনও এক সাংবাদিকের গলা শোনা গেল, 'ধর্ষণ সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'আমার কাছে ধর্ষণের কোনও রিপোর্ট আসেনি। যদি এরকম কোনও তথ্যনির্ভর অভিযোগ আমার কাছে আসে তা হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।' মুখ্যমন্ত্রী একটু থামলেন। তারপর ভাষণ শুরু করলেন, 'আমি

আজ একটা কথা স্পষ্ট করে বলছি। শিল্পের জন্যে কারও জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হবে না। যদি শিবচরণপুর, বেঙ্কেমারি বা রানিচকের মানুষ শিল্পের জন্যে জমি দিতে আগ্রহী না হন তা হলে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সরকার কখনওই তাঁদের ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করবেন না। আমরা বিশ্বাস করি শিল্পের প্রসার না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। আর শিল্প তো হাওয়ায় তৈরি হতে পারে না। তার জন্যে জমি দরকার। আমাদেরই কারও ভুল পদক্ষেপের কারণে যে গুজব ছড়িয়েছিল তার পরিণতি এরকম হবে আমি ভাবিনি। আমি আবার পরিষ্কার করে বলছি, কেউ না দিলে সরকার তাঁর জমি নেবেন না। যিনি নিজে থেকে জমি দিতে আগ্রহী হবেন সরকার তাঁর কাছে থেকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নেবেন।'

সঞ্চালিকা ফিরে এলেন টিভির পর্দায়, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন কোনও জমি জোর করে শিল্পের জন্য নেওয়া হবে না। আমরা আশাবাদী এই আবেদনে সাড়া দিয়ে জমি রক্ষা কমিটি আবার শান্তির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবেন।'

টিভি বন্ধ করে দিল যতীন।

কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, 'তা হলে আন্দোলন শেষ?'

তৎক্ষণাৎ যতীন ধমকে উঠল। 'কে বলল, কে বলল কথাটা? এই যে আমাদের এতগুলো মেয়ে শহিদ হল, চারটে মেয়ে ধর্ষিত হল, তাদের কথা ভুলে সরকার জমি নেবে না ভেবে আনন্দ করব আমরা? এখন আন্দোলন প্রত্যাহার করা মানে কি জানেন না আপনারা?'

পুলিশকে নিয়ে সরকারি পার্টি গ্রামে ঢুকবে। যারা যারা আন্দোলনে আছে তাদের খুঁজে বের করে ভ্যানে তুলে নিয়ে যাবে। মা-বোনেদের সম্মানের কথা তারা ভাববে না। ওরা হয়তো জমি নেবে না কিন্তু ইজ্জত নিতে দ্বিধা করবে না। আপনারা শুনলেন ওরা আমাদের মধ্যে মাওবাদীদের ভূত দেখছে। কে মাওবাদী আর কে নকশালবাদী তা আমরা জানি না। আমরা যখন আক্রান্ত, নিরস্ত্র তখন বাধ্য হয়েছি তাদের সাহায্য নিতে যারা আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। আন্দোলন তুলে নিলে ওরা হয়তো আমাদের কয়েক জনকে মাওবাদী বানিয়ে দশ বছরের জন্যে জেলে পচিয়ে মারবে। অতএব বন্ধুগণ, আন্দোলন বন্ধ করার কোনও

আমারবই.কম

কারণ এখনই ঘটেনি। জমি রক্ষা কমিটি পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে আপনাদের জানিয়ে দেবে।'

শিবচরণপুর থেকে বেরুবার একমাত্র পথ এখন পুবের মাঠ দিয়ে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামে নিয়ে আসা হচ্ছে ওই পথে। দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তবু বেঙ্কেমারির বটগাছ পেরিয়ে তাদের ওপর পার্টির লোকেরা হামলা করছে সুযোগ পেলেই। কাটা রাস্তা জোড়া হয়নি। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ। গ্রাম ছেড়ে কেউ কেউ চলে গেছে ডায়মন্ডহারবার, সেখান থেকে কলকাতায়। জমি রক্ষা কমিটি এখনও পাহারা দিচ্ছে গ্রামে ঢোকার পথগুলোতে। যাওয়ার আগে সাহায্য করতে আসা বিরোধী দলের ছেলেরা তাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে বোমা বাঁধার নিয়মকানুন। মোটামুটি পোক্ত হয়ে গিয়েছে তারা। কিন্তু গ্রামের মানুষ একটু একটু করে অভাবের শিকার হচ্ছে। যদিও জমি রক্ষা কমিটি তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলেনি।

আলতা পেরিয়ে আসা দুটো দল সারা দিন গোবর্ধনের মাছের গুদামে থাকায় সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে থাকে। সন্ধের পর তারা টহল দেয় গ্রামের সীমান্তগুলোতে। প্রায় একতরফা বোমার আওয়াজ এবং গুলির শব্দ পাওয়া যায়। বিজুরির খালের ওপর যে সিমেন্টের ব্রিজ ছিল তার পাশে পুলিশের ক্যাম্প বসেছে। পার্টির ছেলেদের হয়ে পুলিশ শিবচরণপুর থেকে আসা আক্রমণের মোকাবিলা করে।

বন্যা আর থাকতে চাইল না। মা গগনকে বলল, 'অনেক দিন আটকে আছে মেয়েটা। ওকে কালই পৌঁছে দিয়ে আয়।'

বন্যা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'না না। পৌঁছে দিতে হবে না। এই মাঠটা পার করে দিলেই হবে। আমি চলে যেতে পারব।'

গগন যতীনকে খবরটা দিলে সে দেখা করতে এল। অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, 'আপনি মাঠ পেরিয়ে যাবেন কেন? কাল এম এল এ আসবেন। ওঁর সঙ্গে পুলিশ এসকর্ট থাকবে। ভাঙা সাঁকো পর্যন্ত গিয়ে ওঁর গাড়িতে উঠে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবেন।'

বন্যা হাসল, 'ওঁকে কষ্ট দেওয়ার কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া এম এল এ-র গাড়িতে গেলে যারা আমাকে চেনে না তাদের কাছে আমি চিহ্নিত হয়ে যাব। আপনারা এখানকার কথা ভাবছেন, আমি যেখানে

থাকি সেখানে ব্যাপারটা প্রচারিত হোক তা আমি চাই না। মাঠ পেরিয়ে গেলে আমি চুপচাপ যেতে পারব।'

ভোর হওয়ার মুখে চেয়ে নেওয়া সাইকেলে বন্যাকে বসিয়ে গ্রাম ছাড়ল গগন। খানিক বাদে সুনসান মাঠ, এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হচ্ছিল তাকে। ক্যারিয়ার না থাকায় সামনের রডে বসতে হয়েছিল বন্যাকে। প্রায়ই তার শরীরকে স্পর্শ করতে হচ্ছে। ঝাঁকুনি হলে তো কথাই নেই। হঠাৎ বন্যা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কলকাতায় কবে ফিরবেন?'

'আর ক'টা দিন দেখি। জানি না চাকরিটা ফিরে পাব কিনা। এত দিন নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। আবার চাকরি খুঁজতে হবে তা হলে।' সাইকেল চালাতে চালাতে বলল গগন।

'আপনার মায়ের কাছে সব শুনেছি। অন্যের গাড়ি না চালিয়ে নিজেই গাড়ি কিনে চালাচ্ছেন না কেন?' বন্যা জিজ্ঞাসা করল।

'গাড়ি কেনার টাকা কোথায় পাব?'

'কেন? ব্যাঙ্ক তো লোন দেয়। চেষ্টা করেছেন?'

'না।'

'এখন তো সবাই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করে। আমার এক মাসতুতো দাদা ব্যাঙ্কে আছেন। একদিন যদি আসেন তা হলে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। দেখবেন, সহজ রাস্তা ঠিক বেরিয়ে যাবে।' বন্যা হাসল।

গগন কথা বলল না। লোন নিয়ে গাড়ি কিনে ব্যবসা করার কথা সে যে আগে ভাবেনি তা নয়। কিন্তু অত টাকা যদি শোধ না করতে পারে এই ভয়ে পিছিয়ে গেছে। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক তাকে লোন দেবে কেন? লোন পেতে হলে তো অনেক কিছু ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। চাষের জমি ছাড়া তাদের তো কিছু নেই। মা জমি বন্ধক রেখে ধার নিতে কি রাজি হবে। তবু সে বলল, 'আপনার সঙ্গে কীভাবে দেখা করব?'

'শেওড়াফুলি স্টেশনের ডান দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা হাঁটলেই দেখবেন একটা মিষ্টির দোকান, গন্ধেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। তার পাশের গলিতে ঢুকবেন, বাঁ দিকের তৃতীয় বাড়ি। একতলা। আমার ফোন নাম্বার আমি আপনার মাকে দিয়ে এসেছি। আসার আগে একটা ফোন করে এলে আমি অপেক্ষা করব।' বন্যা বলল।

আমারবই.কম

এখন আলো পরিষ্কার হয়েছে। এতক্ষণ সতর্ক হয়ে চালাচ্ছিল গগন। এই সময় যদিও বিজুরির কেউ এত দূরে আসে না তবু বলা যায় না ভেবে ঠিক করেছিল, ওদের দেখলে সাইকেল ঘুরিয়ে নেবে। কিন্তু কিছুই করতে হল না, ওরা স্বচ্ছন্দে ডায়মন্ডহারবারে যাওয়ার রাস্তায় পৌঁছে গেল। বন্যা বলল, 'এখানেই দাঁড় করান।'

'কেন?'

'বাস না পেলে ভ্যানরিকশা নিয়ে ডায়মন্ডহারবারে চলে যাব। ওখান থেকে তো ট্রেন পাবই। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।' বন্যা নেমে পড়ল সাইকেল থেকে।

'আপনার কাছে আমরা, সমস্ত গ্রামের মানুষ কৃতজ্ঞ। আপনি না এলে গ্রামের মেয়েরা এভাবে উদ্বুদ্ধ হত না। আপনি ওদের পালটে দিয়েছেন। আপনাকে এটুকু রাস্তা পৌঁছে দিতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে।' অকপটে বলল গগন।

'কিন্তু আমি যা করতে চেয়েছিলাম তার ফল কী হল? অতগুলো প্রাণ চলে গেল। আমি না এলে ওরা হয়তো ঘর থেকে বের হত না, পুলিশের গুলিও ওদের শরীরে লাগত না। ঘটনাটার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছে আমি কি ঠিক কাজ করেছি? জানি না এর ঠিক উত্তর কী!'

'এ নিয়ে ভাববেন না। যুদ্ধে নামলে তো ক্ষয়ক্ষতি হবেই। ওরা মারা গেল বটে কিন্তু আমরা তো হেরে যাইনি।'

বন্যা বলল, 'আপনারা খুব ভাল। আপনার মাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।'

গগন বলতে চাইল আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে। খুব। কিন্তু বলতে পারল না। দূরে বাস দেখা গেল। বন্যা হাত দেখাতে সেটা কাছে এসে থেমে গেল। বন্যা বলল, 'গগনবাবু, আপনি আসবেন তো?'

মাথা নাড়ল গগন, 'হ্যাঁ।'

বন্যা বাসে উঠে পড়ল। বাস ডায়মন্ডহারবারের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল গগন। বুকের ভেতরটা আচমকা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল তার। বন্যা যেন তাদের বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরতে গিয়ে গগনের মনে পড়ল কুসুমের কথা। সেই যে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপর থেকে কোনও খবর

আসেনি। ওর সঙ্গে যে বাকি তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। ধর্ষিতা বলে দু'-একজন কথা তুললেও অন্যান্য মানুষ প্রতিবাদ করায় তারা চুপ করে গিয়েছে। যতীন তাদের ঘর ছেড়ে শিবচরণপুরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের দেখাশোনার কাজে লাগিয়েছে। ওরাও কুসুমের কোনও খবর দিতে পারেনি।

সাইকেল ঘোরাল গগন। একটু ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। ভক্তহাটের বেশির ভাগ এলাকা সরকারি পার্টির দখলে, কিছুটায় বিরোধী দল রয়ে গেছে। তবে ভক্তহাটের যে ক'জন তাকে চেনে তারা পার্টির সমর্থক হিসেবেই দেখে এসেছে। ধারণাটা যদি বদলে না গিয়ে থাকে তা হলে হাসপাতালে যাওয়াই যেতে পারে।

সরাসরি হাসপাতালে চলে এল গগন। রাস্তায় এখন লোকজন কম। বেলাও বেশি হয়নি। বারান্দার নীচে সাইকেল রেখে তালা দিয়ে দিল সে। মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। কার্তিক আসছে। হাতে খাবারের ঠোঙা।

কাছাকাছি হতে কার্তিকও তাকে দেখতে পেল। বলল, 'বাবু, আপনি এখানে?'

জবাব না দিয়ে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে কী করছ?'

'আমি তো আজকাল এখানেই থাকি।'

'কবে থেকে?'

'অনেক দিন হয়ে গেল।' হাতের কর গুনতে লাগল কার্তিক।

সেটাকে পাত্তা না দিয়ে গগন জিজ্ঞাসা করল, 'কুসুম কেমন আছে?'

'ভাল না বাবু। পা নাড়াতে পারে না। কোনও রকমে উঠে বসতে পারে। আজ ওকে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।' কার্তিক বলল।

'সে কী? ডাক্তার কী বলছে?'

'অনেক টাকার ওষুধ দেওয়ার পর এখন বলছে ওর নাকি নার্ভের অসুখ হয়েছে। সেটা কী ব্যাপার আমাকে বলছে না। তার চিকিৎসা এখানে হয় না।'

'তা এত টাকা খরচ হয়েছে, কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছ, সেখানে তো আরও বেশি খরচ হবে, এসব কি জমি রক্ষা কমিটি থেকে করা হচ্ছে?' গগন জিজ্ঞাসা করল।

আমারবই.কম

'না বাবু। তারা প্রথম কয়েক দিনের ওষুধের দাম দিয়েছিলেন। এম এল এ সাহেব তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কুসুমের সঙ্গে যে তিনটে মেয়ে এসেছিল তারা ভাল হয়ে ফিরে যাওয়ার পরে আর কোনও টাকা এম এল এ সাহেব দেননি।'

'তা হলে? তোমার যা ছিল—।'

হাত নাড়ল কার্তিক, 'আমার কিছুই ছিল না। যা খরচ হচ্ছে সব বড়বাবু দিচ্ছেন। এমনকী আমার খাওয়ার খরচও। আজ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা তিনিই করিয়েছেন। এত দিন যাকে গালাগাল দিত কুসুম সেই লোকটাই এখন ভগবানের মতো ওকে দেখছে। যাই, ওকে খাবার দিয়ে আসি।' কার্তিক দু' পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি কি কাউকে দেখতে এসেছেন বাবু?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দাঁড়ান। এই সময় বাইরের লোকদের ঢুকতে দেয় না। আমার সঙ্গে চেনাজানা হয়ে গিয়েছে। খাবারটা দিয়ে এসে আমি আপনাকে নিয়ে যাব ভেতরে।' কার্তিক চলে গেল।

মিনিটখানেক নড়তে পারেনি গগন। গোবর্ধনকে সে এত কাল যা ভেবে এসেছিল তা এক লহমায় বদলে গেল! গ্রামে থেকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছে গোবর্ধন। তার গুদামে বিদেশিদের আশ্রয় দিয়েছে। গোবর্ধন তাকে বলেছিল তুমি যদি কিছু জেনে থাক তা সঠিক নাও হতে পারে। তার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়নি ও। কিন্তু গোপনে দিনের পর দিন কুসুমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে গেছে।

এখন কুসুমের কাছে গিয়ে সে কী কথা বলতে পারে। কুসুমই বা কী বলবে? নিশ্চয়ই সে জেনে গেছে তার জীবন রক্ষা করার ব্যাপারে গোবর্ধন কী ভূমিকা নিয়েছে। গগন চুপচাপ বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে।

ভক্তহাটের মোড়ে এসে সে লক্ষ করল কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ রে রে করে তেড়ে আসছে না। একটা সরকারি অফিসের সামনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। গগন কৌতূহলী হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে জানতে পারল, সরকার ঘোষণা করেছেন যারা জমি স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে চান তারা উপযুক্ত প্রমাণপত্র এবং দলিল নিয়ে দেখা করলে

সরকার জমির দাম বাবদ চেক দিয়ে দেবেন। খবরটা শুনে গগনের মনে হল মাড়োয়ারিরা যে দাম দিয়েছিল সরকার যদি তার থেকে বেশি দাম দেন তা হলে অনেকেই প্রলোভিত হবে। হঠাৎ তার স্বপনদার কথা মনে পড়ল।

স্বপনদার বাড়ির সামনে এসে সে অবাক হয়ে গেল। বোঝাই যায় বাড়িটাতে ভাঙচুর হয়েছে। দরজায় তালা ঝুলছে। একটি ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

'স্বপনদা নেই?'

'না। ওরা কলকাতায় চলে গিয়েছে।'

'কেন?'

'দেখে বুঝতে পারছেন না?'

'কারা করল?'

'জানি না।' বলে ছেলেটা সরে গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে সাইকেল চালিয়ে গ্রামে ফিরছিল গগন। গোলমালের সময় স্বপনদার বাড়িতে হামলা হয়েছিল। নিশ্চয়ই বিরোধী দলের লোকরাই করেছে। কিন্তু সরকারি পার্টির ছেলেরা বাধা দেয়নি কেন? স্বপনদা পদত্যাগ করেছিল বলে!

আচমকা দূর থেকে গাছটা চোখে পড়ায় বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল গগনের। অন্যমনস্ক হয়ে সে চেনা পথে চলে এসেছে। বেক্কেমারির বটগাছটা এখন তার সামনে। এই জায়গাগুলো পার্টির ছেলেরা দখল করে রেখেছে। এখান থেকে ফিরে ভক্তহাট হয়ে যে রাস্তা-মাঠ দিয়ে এসেছিল সেটা ধরলে বহু সময় লেগে যাবে গ্রামে পৌঁছাতে। সে তাকিয়ে দেখল সামনে কেউ নেই। যা হওয়ার তা হবে বলে সাইকেল চালাল সে। গাছটা পার হতেই ওদের দেখতে পেল গগন। রাস্তার একপাশে আটজন দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। একজন হাত তুলল, 'কোথায় যাবেন?'

ছেলেটিকে চিনতে পারল না গগন। কিন্তু মিথ্যে কথা বলল, 'বিজুরি।'

'কার কাছে?'

'বিকাশের কাছে।'

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

আমারবই.কম

‘কলকাতা থেকে।’

দুটো ছেলে এগিয়ে এসে ওর পকেট, পেট পরীক্ষা করল। করে বলল, ‘নেই।’ আগের ছেলেটি অনুমতি দিল, ‘যান।’

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। প্যাডেলে চাপ দিল গগন।

দ্রুত চলে এল সে অনেকটা। সোজা গেলে বিজুরি, ডান দিকে শিবচরণপুর। ভাঙা সাঁকোর কাছে পৌঁছে সে চার পাশে তাকাল। পার্টির কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে ওপারে আসতেই আচমকা একটা বোমা উড়ে এল আড়াল থেকে। কোনও রকমে লাফিয়ে সরে যেতে বোমাটা দূরে গিয়ে ফাটল সশব্দে।

যখন চিৎকার করল, ‘এ্যাই, কে ছুড়ছে? আমি গগন। আমাকে চিনতে পারছ না?’

এক মিনিট সব চুপচাপ। তার পর দুটো ছেলে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। একজন বলল, ‘গগনদা! আপনি? আমাদের কেউ তো ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে গ্রামে আসে না, আসতে পারে না। তাই ভাবলাম—।’

‘ভাবলাম! চোখে দেখবে না কে আসছে! আর একটু হলে তোমাদেরই শ্মশানে নিয়ে যেতে হত আমাকে!’ সাইকেলে উঠে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল গগন।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। কেউ এগিয়ে আসছে না জমি দখল করতে। সরকার একেবারেই উদাসীন। মাঝে মাঝে বোমা ফাটছে গ্রামের সীমান্তে। এর মধ্যে দুই দলের আশ্রিতরা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে গিয়ে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে এল। গ্রামের দোকানগুলোয় টান পড়েছে। লুকিয়ে চুরিয়ে মাল আনতে হচ্ছে। কিন্তু মানুষের হাতের টাকা শেষ হয়ে গেল। ঠিক তখনই রটে গেল সরকার মোটা টাকা দিয়ে জমি কিনছেন। রানিচক এমনকী বেঙ্কেমারির অনেকে গিয়ে জমি বিক্রি করে সরকারের কাছ থেকে চেক নিয়েছে। মাড়োয়ারিরা যে জমি কিনেছিল তা তারা সরকারকে বিক্রি করে দিল ভাল মুনাফা রেখে। শিবচরণপুরে এই খবরগুলো আসছিল।

জমি রক্ষা কমিটি ফাঁপড়ে পড়ল। ঘরে অভাব এবং বাইরে প্রলোভনের

হাতছানি এখন এত প্রবল যে গ্রামের মানুষকে সামলে রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আলতা হয়ে আসা যোদ্ধাদের থাকার সময়সীমা শেষ, সেটা বাড়াতে হলে আবার চুক্তি করতে হবে টাকা দিয়ে। জমি রক্ষা কমিটি ঠিক করল যোদ্ধাদের টাকা দিয়ে না রেখে সেই টাকার কিছুটা গ্রামের মানুষের সাহায্যে খরচ করলে তাদের ক্ষোভ কমবে।

বিজুরি এখন একদম শান্ত হয়ে গেছে। সেখান থেকে কোনও বোমা আর উড়ে আসছে না। এমনকী বেঙ্কেমারির বটগাছের নীচ দিয়ে রাস্তায় যাতায়াত করলে ওরা এসে বাধা দিচ্ছে না। ফলে শিবচরণপুরের মানুষদের সাহস বাড়ছিল। দিনের বেলায় বিশেষ প্রয়োজনে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে ভক্তহাটের দিকে যেত। আসত।

এই ভাবে কয়েক মাস চলে যাওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ‘রাজ্যের একটি বিশেষ জায়গায় আইনের শাসন নেই, কোনও জনহিতকর কাজ করা যাচ্ছে না। এমনকী পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব নেই বলে সেই বাবদ বরাদ্দ টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। এটা আর চলতে পারে না।’ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানালেন সি আর পি পাঠাবার জন্যে। কেন্দ্রীয় সরকার ভরসা দিলেন তাঁরা সি আর পি পাঠাবেন কিন্তু তাদের সংখ্যা কত হবে এবং কবে পাঠাবেন তা জানাতে পারলেন না।

পুলিশের ওপর ভরসা রাখা যাচ্ছিল না। জমি রক্ষা কমিটি আলোচনা করল। সি আর পি শুধু বেঙ্কেমারি, শিবচরণপুর অথবা রানিচকে পাহারার কাজে আসছে না, তারা বিজুরিতেও ক্যাম্প করবে। পুলিশ এলে তাদের পেছন পেছন ছায়ার মতো পার্টির হার্মাদ বাহিনী চলে আসত কিন্তু সি আর পি সেটা মেনে নেবে না। সরকার যখন জোর করে জমি দখল করবে না এবং সি আর পি এসে শান্তির আবহাওয়া তৈরি করতে সাহায্য করবে তখন এই প্রস্তাব মেনে নিতে কোনও অসুবিধে নেই। ক্ষুব্ধ হয়ে থাকা গ্রামবাসীরাও জমি রক্ষা কমিটির আওতায় থেকে যাবে।

আমন্ত্রিত যোদ্ধারা ফিরে গেল। যেসব অস্ত্র তখনও বেঁচে ছিল তা ফেরত নিয়ে গেল ওরা। জমি রক্ষা কমিটির অনুরোধে কিছু সাধারণ গ্রেনেড রেখে গেল বদান্যতা দেখিয়ে। সি আর পি এসে গেলে তারা নিশ্চয়ই যাবতীয় অস্ত্র উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। গ্রামে বোমার ভাণ্ডার এখন প্রায় নিঃশেষিত। ছেলেরা এখন হাতবোমা বাঁধছে! সি আর

আমারবই.কম

পি-র চোখের সামনে যাতে না পড়ে তাই গোবর্ধনের মাছের গুদামের নীচে মাটি খুঁড়ে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হল। গোবর্ধনের এ ব্যাপারে আপত্তি খুব। প্রথমত ওগুলোর প্রয়োজন হলে নিয়ে আসতে প্রচুর সময় লাগবে। তা ছাড়া কেউ যদি ফাঁস করে দেয় তা হলে তাকে জেলে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত চাষের মাঠে গর্ত করে প্লাস্টিকে মুড়ে সেগুলো রেখে দেওয়া হল।

টিভি-তে খবর হচ্ছিল। মা এবং ভাই-এর সঙ্গে ঝরনা মন দিয়ে খবর শুনছিল। গগন ঘরে ঢুকে ঝরনার দিকে তাকাল। সেই আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকে ঝরনা চব্বিশ ঘণ্টার বেশির ভাগ সময় এই বাড়িতেই কাটাচ্ছে। ওর বাবা এর মধ্যে একবার খবর পাঠিয়েছিল মদনকে দিয়ে যাতে ঝরনা বিজুরিতে চলে যায়। ঝরনা রাজি হয়নি।

সংবাদ পাঠক জানালেন, রাজ্য সরকার যত সি আর পি চেয়েছিলেন তা কেন্দ্র পাঠাতে পারছে না এখনই। তবে প্রথম দল কলকাতায় পৌঁছে যাবে আগামীকাল। এবং আগামী পরশু থেকে উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছে দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

গ্রামে এখন শান্তির আবহাওয়া। দীর্ঘদিন যে কষ্ট করে মানুষ থেকেছে তা দু'দিন পরে শেষ হয়ে যাবে। যারা নিজেদের এক ফসলি জমি বিক্রি করেনি তারা মনে মনে একটা আশা লালন করছে। জমির প্রয়োজনে সরকার নিশ্চয়ই দাম বাড়াবে। ওই এক ফসলি জমি রেখে যা পাওয়া যায়, বর্ধিত দাম পেলে তার অনেক বেশি আয় হবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সি আর পি কলকাতায় এসে গেল। জমি রক্ষা কমিটি আলোচনায় বসল। কাটা রাস্তা আবার জোড়া দেওয়া উচিত কিনা। সি আর পি-র সঙ্গে তাদের কোনও শত্রুতা নেই। আলোচনায় ঠিক হল অন্তত একটি রাস্তা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করে দিলে সি আর পি বুঝতে পারবে তারা সহযোগিতা করতে চাইছে।

দুপুরের পর খালধারের রাস্তাটা বোজাতে শুরু করল ছেলেরা। কাজটা গ্রামের দিক থেকে আরম্ভ করে যখন শেষ কাটা রাস্তায় তারা মাটি ফেলছে তখন বিজুরির দিক থেকে চিৎকার ভেসে এল, সেই সঙ্গে গুলি এবং বোমার শব্দ। বোমাগুলোর কয়েকটা এসে পড়ল রাস্তায়। তৎক্ষণাৎ

হাতবোমাগুলো, যা গ্রামের ছেলেরা বানিয়েছিল এবং মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়নি, দ্রুত নিয়ে এসে পালটা আক্রমণ শুরু করল জমি রক্ষা কমিটির ছেলেরা। কিন্তু এই বোমাগুলো তেমন জোরদার ছিল না এবং বেশ কয়েকটা ছোড়া সত্ত্বেও ফাটেনি।

একটা সময় বোমাযুদ্ধ শেষ হল। সকাল হল।

জমি রক্ষা কমিটি ফাঁপড়ে পড়ল। গত রাতের অভিজ্ঞতা বলছে তাদের কাছে মাটিতে পুঁতে রাখা গ্রেনেড বোমা এবং বন্দুক ছাড়া কোনও শক্তিশালী অস্ত্র নেই। গত রাত্রে যদি যুদ্ধটা বেশিক্ষণ চলত তা হলে ওগুলো মাটি থেকে না তুলে উপায় ছিল না। তাই ওগুলো লুকিয়ে না রেখে যেকোনও সময় ব্যবহারের জন্যে হাতের কাছে রাখাই উচিত। কিন্তু সি আর পি গত রাত্রেই সদরে এসে গেছে। আজ সকালেই ওরা গ্রামের দখল নিলে বাইরে থেকে ওরা আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু অস্ত্রগুলো বের করে আনলে সি আর পি বাজেয়াপ্ত করবে সহজেই।

দিনটা প্রতীক্ষায় কেটে গেল। টিভি-তে সারা দিন ধরে দেখানো হল সি আর পি-দের। তাদের সদরে ক্যাম্প করে রাখা হয়েছে। হুকুম পাওয়া মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে গ্রামগুলোতে। কিন্তু কীভাবে দখল নেবে তার পরিকল্পনা জেলা কর্তৃপক্ষ করে উঠতে পারছিলেন না। ফলে এত কাছাকাছি এসেও সি আর পি-কে শুয়ে বসে কাটাতে হচ্ছিল। আর তাদের আগমনের আশায় অধীর হয়ে উঠছিল শিবচরণপুর-বেঙ্কেমারির মানুষ।

শেষ পর্যন্ত দিন শেষ হল, রাত নামল। জানা গেল সি আর পি আগামীকাল সকালে গ্রামে ঢুকবে। জমি রক্ষা কমিটি বুঝল আজ শেষ রাত, কাল থেকে আর গ্রামে তৈরি হাতবোমাগুলোর প্রয়োজন হবে না।

রাত ন'টায় প্রথম বিস্ফোরণ হল। ভাঙা সাঁকোর দিকে মাটি কেঁপে উঠল। জমি রক্ষা কমিটির লোকজন কোনও রকমে একত্রিত হয়ে বোমা ছুড়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করল। একটু থমকাল আক্রমণকারীরা।

স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামবাসীদের আবেদন জানাতে লাগল যে যা অস্ত্র

আমারবই.কম

পারে নিয়ে বেরিয়ে আসতে। গগন বেরুতে যাচ্ছিল, মা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কী ব্যাপার, দেখে আসি।'

'না যাস না। আমার মন ভাল বলছে না।'

'ভাল বলছে না মানে?'

'মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু হবে।'

'তা হলে তো আরও দরকার আমাদের সকলের যাওয়া।' গগন বেরিয়ে এল।

একসঙ্গে চারটে রাস্তা ধরে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছে সরকারি পার্টির লোক। জমি রক্ষা কমিটির ছেলেদের বোমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের ভেতরে খবরটা ছড়িয়ে যেতে মেয়েরা লাঠি কাটারি নিয়ে বেরিয়ে এল পিল পিল করে। কিন্তু চার দলে ভাগ হয়ে আসা পার্টির ছেলেদের কাছ বরাবর পৌঁছাতে পারছিল না তারা। শক্তিশালী বোমা উড়ে আসছে গ্রামের দিকে, সেই সঙ্গে রাইফেলের গুলি। মেয়েরা বুঝতে পারল তাদের হাতের লাঠি বা কাটারি ওদের আঘাত করার সুযোগ পাবে না। গ্রাম থেকে প্রতিরোধ করা বন্ধ হয়ে গেলে উল্লসিত হল আক্রমণকারীরা। তারা সোল্লাসে এগিয়ে আসতে লাগল। অস্ত্র হাতে যারা এগোচ্ছে তাদের মুখ গামছায় ঢাকা।

মেয়েরা পালাচ্ছিল। কে কোথায় যাবে জানে না, শুধু দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু তাদের দু'-একজনের মনে জেদ প্রবল হওয়ায় কাটারি হাতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল 'আয়, এগিয়ে আয়, বুকের পাটা থাকে তো বন্দুক ফেলে সামনে আয়।'

আক্রমণকারীরা থমকাল। মোটাসোটা যে মেয়েটি সবচেয়ে বেশি চেঁচাচ্ছিল তাকে খুব ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। একজন আক্রমণকারী হঠাৎ খুব শান্তভাবে এগিয়ে এল ওদের কাছে। তারপর খুব কাছ থেকে গুলি চালাল। পর পর ছ'টা গুলি ঝাঁঝরা করে দিল মেয়েদুটোকে। তারা মাটিতে পড়ে যেতেই উল্লসিত দলটা গ্রামে ঢুকে পড়ল। প্রায় একই সঙ্গে অন্য তিনটে দল চলে এসেছিল গ্রামের মধ্যে।

চারটে দল যখন একত্রিত তখন জমি রক্ষা কমিটির কোনও সদস্য ধারে কাছে নেই। তারা জমা হয়েছিল গোবর্ধনের মাছের গুদামে। কেউ

কেউ চাপ দিচ্ছিল পুঁতে রাখা অস্ত্রগুলো বের করে এনে ওদের আক্রমণ করলে এখনও সুযোগ আছে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে পারার। যতীন খুব ভেঙে পড়েছিল। সে গগনকে বলল, 'এটা আমাদের সঙ্গে বিরাট প্রতারণা। সি আর পি এনে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখে সরকার পার্টির ছেলেদের দিয়ে হামলা করে গ্রাম দখল করল। ওরা যেই জেনে গেল সি আর পি আসছে বলে আমরা বোমাগুলি লুকিয়ে ফেলছি, বাইরে থেকে যারা সাহায্য করতে এসেছিল তারা চলে গেছে, তখনি ওরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল। সি আর পি গ্রামে ঢুকে গেলে ওরা এটা কিছুতেই করতে পারত না। আমাদের দুর্বল জায়গাটা সরকার ওদের ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে। উঃ।' দু' হাতে মাথা ধরে বসে থাকল যতীন।

খগেন জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী হবে? কেউ তো গ্রামের দিকে যেতে পারছে না।'

গোবর্ধন বলল, 'অন্ধকারে অস্ত্রগুলো মাটি থেকে তুলে আনতেই হবে যতীন। ওরা আমাদের সন্ধানে এখানে যাতে না আসতে পারে তার জন্যে ওগুলো দরকার।'

যতীন বলল, 'যা ভাল বোঝ তাই করো।'

শিবচরণপুরের বাড়িগুলোতে কোনও মানুষ আছে বলে বোঝা যাচ্ছিল না। বিজয়ী বাহিনী একত্রিত হলে বিকাশ বলল, 'ওকে ধরে নিয়ে আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ছেলে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল মদনকে। বিকাশ বলল, 'তুমি কোন পার্টি করো?'

'আমি? মাল্লু পার্টি। যে ধার দেয় তার সমর্থক।' মদন হাসল।

'শোনো। এই গ্রামে জমিরক্ষা কমিটির সদস্যদের বাড়িগুলো নিশ্চয়ই তুমি চেনো? আমি তোমার মুখে না শুনতে চাই না।' বিকাশ ধমকাল।

'চিনি।'

'বাঃ। বাড়িগুলো আমাদের দেখিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতল মদন, 'দশ টাকা দাও। ধার দাও।'

বিকাশের পাশে দাঁড়ানো একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'শালার হাতটা কেটে দেব?'

আমারবই.কম

'না।' তাকে থামিয়ে পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে মদনকে দিল বিকাশ, 'হয়েছে? বলো।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে শিবচরণপুরের আকাশ লাল হয়ে গেল। আগুনের শিখা সম্ভবত চাঁদ স্পর্শ করতে চাইছিল। জ্বলন্ত বাড়ি থেকে শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার হাত ধরে পিল পিল করে বেরিয়ে এল মেয়েরা। তারা বুক চাপড়াল। চোখের সামনে তাদের এতকালের বাসগৃহ ছাই হয়ে যাচ্ছে। গগনের মা তার বোবা ছেলেকে নিয়ে এলোপাথারি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কোথায় যাচ্ছিলেন তা নিজেই জানেন না। হঠাৎ বোবা ছেলে গোঁ, গোঁ করে তার সংবিৎ ফিরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শরীরটাকে দেখাল।

বিস্ফারিত চোখে গগনের মা দেখল দুটো শরীর পড়ে আছে। রক্তে ভিজে গিয়েছে মাটি। বোবা ছেলে যাকে দেখাচ্ছিল তার শরীরের পাশে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল মহিলা। শ্যামলা রঙের মোটাসোটা সরল চেহারার মেয়েটার মুখ দু'হাতে ধরে চিৎকার করে ঝরনা শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে একটা কঁকানি ছিটকে বের হল গলা থেকে। আচমকা তার শরীর শুকিয়ে গেল। এক ফোঁটা কান্নার জল শরীরে নেই।

ভোর হল শিবচরণপুর, বেন্ধেমারিতে। শুনশান চারধার। জ্বলতে জ্বলতে আগুন মুখ ডুবিয়েছে ছাই-এর গাদায়। আর তখনই হই হই করে ফিরে আসা শুরু হল ঘরছাড়াদের। জমি রক্ষা কমিটির আন্দোলন শুরু হতেই পার্টির যেসব সমর্থক সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিল বিজুরি অথবা ভক্তহাটে, তারা তাদের বন্ধ বাড়ির তালা খুলতে লাগল। ভোরের প্রথম আলোয় গ্রামের রাস্তায় মিছিল বের হল, 'শান্তি চাই শান্তি চাই। সংঘাত নয়, শান্তি চাই।' গত রাতে যেসব শরীর গুলি বা বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল তাদের কাউকেই আজ দেখা গেল না। শান্তির মিছিল হেঁটে গেল শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ওপর দিয়ে, চলে যাওয়ার পর মাটি আর পাঁচটা জায়গার মতো সাধারণ, স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ঠিক সকাল ন'টায় সি আর পি বাহিনী আইন-শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গ্রামে ঢুকল মার্চ করতে করতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের দখল নিয়ে নিল তারা। ক্যাম্প বানিয়ে ফেলল দুটো জায়গায়। টহলদারি শুরু হল। তাঁদের পেছন পেছন ঝাঁপিয়ে পড়ল খবরের কাগজ এবং টি

ভি মিডিয়ার মানুষ। ইন্টারভিউ নিতে লাগল সামনে যাকে পেল। গোটা বাংলা শুনল ঘরে ফিরতে পেয়ে শিবচরণপুরের মানুষ খুশি হয়েছেন। কিন্তু পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলোর ছবি তোলার সময় প্রথম দিকে কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। একজন পার্টির সমর্থক ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তিনি ভোরবেলায় গ্রামে ফিরে এসেছেন, রাত্রে কী হয়েছিল তা জানেন না।

গোবর্ধনের মাছের গুদামে, গুদামের পেছনে সামনে তখন শ' খানেক মানুষের ভিড়। টিভিতে ঘোষণা করা হচ্ছে, সি আর পি এসে যাওয়ায় আর সংঘাতের সম্ভাবনা নেই। যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন তারা স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু তার আগে ওদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার কাহিনি। কেউ সাহস পাচ্ছিল না গ্রামের দিকে এগোবার।

গোবর্ধন পরামর্শ দিল, পরিত্রাণের একমাত্র রাস্তা আলতায় চলে যাওয়া। সেখান থেকে বোট নিয়ে রায়গঙ্গা হয়ে কলকাতার বাস বা ট্রেন ধরা। সি আর পি নিশ্চয়ই গ্রামে বসে থাকবে না। তারা যে কোনও মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারে। এসে তাদের ধরে যে কোনও একটা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে পুলিশের হাতে যে তুলে দেবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

প্রস্তাবটা চাউর করে দেওয়া হলেও দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে অজানা আলতা নদীর দিকে যেতে সাহসী হল না অনেকেই। কলকাতার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার বাসনা নিয়ে গোবর্ধনের সঙ্গে যতীন এবং আরও কয়েকজন রওনা হয়ে গেল আলতার পথে।

গগন ইতস্তত করছিল। সে খবর পেয়েছে তার বাড়ি পোড়ানো হয়নি। পার্টির সমর্থকরা পোড়াতে চেয়েছিল কিন্তু বিকাশ আপত্তি করেছিল। সে নাকি চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমি জানি এই বাড়িতে আমাদের সমর্থকরাই থাকেন। এখানে কেউ আগুন দিয়ো না।' কিন্তু তার আগেই কেউ কেউ মাকে ভাই-এর হাত ধরে দৌড়াতে দেখেছে। মা এবং ভাইকে অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলে রেখে সে কলকাতায় যেতে পারল না।

বেলা একটা নাগাদ সি আর পি বাহিনী চলে এল গোবর্ধনের মাছের গুদামে। ওরা আসবে এই আশঙ্কায় চাষের মাঠ থেকে তুলে আনা

আমারবই.কম

অস্ত্রগুলো আবার উঠোনের মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে কোনও অস্ত্র না পেয়ে খুশি হয়ে সি আর পি প্রধান জানালেন, ইচ্ছে করলে গ্রামবাসীরা যে যার বাড়িতে ফিরতে পারেন। তাঁরা রক্ষা করবেন।

কিন্তু কোথায় ফিরবে মানুষগুলো। চিৎকার, কান্না শুরু হয়ে গেল। নরম গলার স্বর শুনে আতঙ্ক ভুলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল সবাই। শেষ পর্যন্ত সি আর পি প্রধান জানালেন, আপাতত এখানেই ক্যাম্প করে থাকুন সবাই। দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানাবেন।

সি আর পি চলে গেলে গৌরাঙ্গের ব্যবস্থাপনায় মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে খিচুড়ি তৈরির আয়োজন শুরু হল।

সারা রাত জেগে কাটিয়ে অভুক্ত থেকে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল গগনের। তবু সে পা বাড়াল। দু'-একজন আপত্তি করল। যাওয়াটা ঠিক হবে না। সি আর পি তো সব জায়গায় বসে নেই। দুটো লোক লাঠি নিয়ে তেড়ে এলে কিছু করার থাকবে না। একজন বলল, 'না না। কিছু হবে না। শুনলাম ওর বাড়িতে নাকি পার্টির লোকরা আগুন দেয়নি। বেহ্মেমারির বটগাছের সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ভাঙা সাঁকো দিয়ে কেউ যখন আসতে পারত না তখন গগনদা এসেছে। পার্টির নেতারা ওকে নিজেদের লোক বলেই ভাবে। যাও গগনদা। যদি ফিরে আসো দু' বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে এসো মনে করে।'

অবাক হয়ে তাকাল গগন। তা হলে এরা তাকে সন্দেহ করছে! নিজেদের একজন বলে ভাবছে না? সে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমার মা এবং ভাই কাল রাত থেকে কোথায় গিয়েছে তা কেউ জানে না। আমি ওদের খুঁজতে যাচ্ছি। ওরা যদি আমাকে পার্টির লোক বলে মনে করত তা হলে মা-ভাইকে ঘরছাড়া হতে হত না।'

লোকটা জবাব দিল না।

অনেকটা পথ। গগনের মাথা ঘুরছিল। জিরোবার জন্যে গ্রামের প্রথম বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। এক গ্লাস জলের জন্যে সে বাড়িটার সামনে এগিয়ে যেতেই একটা বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠল, 'জমি-রক্ষা এসেছে, জমি-রক্ষা এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মহিলা এসে বাড়ির সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। হতভম্ব হয়ে গেল গগন। এই বাড়ির লোকজন কখনওই কোনও পার্টির সক্রিয় সমর্থক ছিল না। আজ জমি-রক্ষা কমিটির একজনকে ছোঁয়াচে রুগির মতো এড়িয়ে গেল? আবার হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা যেতেই কেউ ডাকল, 'গগনদা না?'

গগন তাকাল। কমল। বিকাশের সঙ্গে ওকে দেখেছে সে।

কাছে এসে কমল বলল, 'তুমি কোথায় ছিলে কাল? বিকাশদা খুঁজছিল।'

'কেন?'

'তোমাদের ধারী মদন তোমাকে পার্টিবিরোধী বলেছিল। তাই শুনে বিকাশদা খুব খেপে যায়। আমাকে বলে তোমার খবর নিতে।' কমল বলল।

'কেন? তোমরাই তো পুলিশকে বলেছিলে আমি চায়ের দোকানদারকে খুন করেছি।'

'আরে ছাড়ো তো। যুদ্ধের সময় ওরকম কথা বলতে হয়। বিকাশদা এ নিয়ে কম রাগারাগি করেনি। তা এখন যাচ্ছ কোথায়?' কমল হাসল।

'আমার মা-ভাইকে খুঁজতে।'

'ও। চলোতো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আরে কাল রাত্রে কিছু মহিলা আর বাচ্চা ভয় পেয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছিল। আমরা তাদের নিয়ে গিয়েছি স্কুলবাড়িতে। নামটাম লিখে রাখা হয়েছে। কিন্তু কেউ আর ওখান থেকে বেরুতে চাইছে না। দ্যাখো, ওদের মধ্যে তোমার মা-ভাই আছে কি না।'

গগন দু'পা হেঁটে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের বাড়ির দরজা খোলা। একটি কিশোর তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। গগন তাকে বলল, 'এক গ্লাস জল দেবে ভাই?'

ছেলেটি ভেতর থেকে জল এনে দিলে এক শ্বাসে খেয়ে নিল গগন।

স্কুলবাড়ির সামনে সি আর পি ক্যাম্প হয়েছে। ওদের দেখে দু'জন সেপাই জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

আমারবই.কম

'ভেতরে যাব। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে।' কমল বলল।

লোকদুটো এগিয়ে এসে ওদের পকেট কোমর হাঁটুতে হাত বুলিয়ে অনুমতি দিল। স্কুলের হলঘরের দরজায় দু'জন মেয়ে বসেছিল। কমলকে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল।

কমল বলল, 'ইনি গগনদা। বিকাশদার বন্ধু। দেখুন তো এর মায়ের নাম লিস্টে আছে কিনা।'

'কী নাম?' একজন লিস্ট বের করল।

'নিরুপমা, নিরুপমা দেবী।' গগন বলল।

লিস্টে চোখ বুলিয়ে মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না নেই।'

দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, 'সবাই নিজের নাম বলেছে কিন্তু দু'জন বলেনি।'

কমল বলল, 'কোথায় তারা?'

ভেতরে।'

'আমরা যাব না। তোমরা ওদের নিয়ে আসবে?'

মেয়েদুটো ভেতরে চলে গেল। কমল বলল, 'এখানে না পেলে—, আচ্ছা, যেখানে জমি রক্ষা কমিটি ক্যাম্প করেছে সেখানে খোঁজ নিয়েছেন?'

গগন এক লহমা চিন্তা করল। সে যে ওখান থেকেই আসছে তা কমলকে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। বলল, 'খোঁজ নিতে হবে।'

এই সময় মেয়েদুটো যাদের নিয়ে এল তাদের দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল গগন, 'মা! তুমি এখানে? তোমরা কেমন আছ?'

কোনও জবাব না পেয়ে সে মুখ সরিয়ে মায়ের দিকে তাকাল। মা নির্বিকার। চোখ স্থির। ঠোঁটদুটো যেন জুড়ে গেছে। মায়ের একটা হাত শক্ত করে ভাইয়ের হাত ধরে আছে। ভাই-এর মুখ থেকে গোঙানি বের হল। সজোরে বলতে চেষ্টা করল কিছু। তারপর মায়ের ধরে থাকা হাত দেখাল।

একটি মেয়ে বলল, 'বোধহয় মানসিক শক খেয়ে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওঁর। ছেলেটার হাত কিছুতেই ছাড়ছেন না। বোধহয় ধরে আছেন এই বোধটাই ওঁর নেই।'

গগন বলল, 'আমি কি ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' কমল মাথা নাড়ল।

সি আর পিদের বোঝাতে হল। তাদের একজন অফিসার এসে সব শুনে অনুমতি দিলেন নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বাড়িতে নিয়ে এসে অনেক চেষ্টা করে ভাইকে মুক্ত করতে পারল গগন। তারপর তাকে বলল, 'ভাত বসাতে পারবি?'

ছেলেটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে চলে গেল।

মা-কে জোর করে একটা চেয়ারে বসাল গগন। তারপর অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল সে। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না মায়ের মুখে।

কান্না ছিটকে বের হল গগনের মুখ থেকে।

গোরা দত্তের মোটরবাইকের পেছনে বসে গ্রামে ফিরলেন যদুনাথ। বাইক থেকে নেমে তার নজর গেল গগনদের বাড়ির ওপর। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'এ কী! ওই বাড়ি বেঁচে আছে?'

গোরা দত্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? ওটা কার বাড়ি?'

ওদের দেখতে পেয়ে পার্টির কর্মীরা ভিড় জমাল। একজন বলল, 'গগনদার বাড়ি।'

যদুনাথ বললেন, 'অত্যন্ত ধূর্ত। জমিরক্ষা কমিটির মাতব্বর।'

গোরা দত্ত ছেলেদের দিকে তাকাল। ওদের একজন বলল, 'বিকাশদা নিষেধ করেছিল।'

এই সময় সি আর পি-র জিপকে এগিয়ে আসতে দেখে ভিড় হালকা হয়ে গেল। জিপে বসে থাকা অফিসার গম্ভীর গলায় বললেন, 'ভিড় করবেন না। যে যার কাজে চলে যান।'

গোরা দত্ত বলল, 'ওরা অন্যায় কিছু করছে না।'

'এটা আপনার বাড়ি?'

'না। ওঁর বাড়ি।'

যদুনাথ হাতজোড় করে বললেন, 'উনি গোরা দত্ত। পার্টির বড় নেতা। বিজুরিতে থাকেন।'

'তা হলে বিজুরিতেই চলে যান।'

আমারবই.কম

জিপ চলে গেল। গোরা দত্ত দাঁতে দাঁত চাপল, 'শালাদের যদি আরও একদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত—!'

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে একটি রাত সময় পাওয়া গিয়েছিল। তাতেই তো মাজা ভেঙে গেছে ওদের। এসো। চা খেয়ে যাও।' যদুনাথ বললেন।

'না না। অনেক কাজ আছে।' গোরা দত্ত মাথা নাড়ল।

'আরে ঘরে আইবুড়ো মেয়ে ফেলে গিয়েছিলাম। কিছু না খেয়ে গেলে আমি তার বিয়ে দিতে পারব না। এসো ভাই।'

খিড়কি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন যদুনাথ। চিৎকার করে ডাকলেন, 'ঝরনা, ঝরনা মা। দ্যাখ, এসে গিয়েছি।'

কোনও সাড়া না পাওয়াতে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সব ক'টা ঘর ঘুরে দেখলেন মেয়ে বাড়িতে নেই। গোরা দত্ত এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'বাড়িতে নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?'

'একা থাকতে ভয় পেয়ে বোধহয় অন্য কারও বাড়িতে গিয়েছে।' গোরা দত্ত বলল।

'যাওয়ার তো একটাই জায়গা। ওই গগনের মায়ের কাছে যায়। অনেক আপত্তি করেছি কিন্তু শুনতেই চায় না।' যদুনাথ বললেন।

ওরা রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই বিকাশকে দেখা গেল সাইকেলে চেপে দ্রুত আসছে। সাইকেল থেকে নেমে সে বলল, 'গোরাদা, কখন এলেন?'

'এইমাত্র।' গোরা দত্ত বলল।

'ওহে বিকাশ, দ্যাখো তো, তোমার বন্ধুর বাড়িতে আমার মেয়েটা আছে কিনা। তুমি তো দয়া করে ওর বাড়ি বাঁচিয়ে দিয়েছ।' যদুনাথ বললেন।

গোরা দত্ত বলল, 'বিকাশ, এই নিয়ে পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। যাও।'

বিকাশ গগনদের বাড়িতে ঢুকল। ঢুকেই কান্নার আওয়াজ কানে এল তার। উঠোনে পা রেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। গগন কেঁদেই চলেছে মায়ের কোলে মাথা রেখে, মা বসে আছে স্থির হয়ে। সে ডাকল, 'গগন, এই গগন।'

গগনের কান্না থামল। শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বিকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

মাথা নাড়ল গগন। মুখে কিছু বলল না।

'কাঁদছিস কেন?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল গগন। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ছোট ভাই। তাকে দেখতে পেয়ে বিকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের বাড়িতে ঝরনা এসেছে? ওর বাবা ডাকছে।'

গোঁ গোঁ শব্দ তুলে মাথা নেড়ে না বলল ছোট ভাই। তার পর দুটো হাত বন্দুকের মতো তুলে শব্দ তুলল, 'ওঁ ওঁ ওঁ। তারপর ধপ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। অবাক হয়ে গিয়েছিল বিকাশ। ছোটভাই উঠে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছিস তুই? কে গুলি করল ওকে?'

এবার যা বোঝাতে চাইল তা বোধগম্য হল না বিকাশের। সে গগনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও যা বলছে তা কি সত্যি?'

মাথা নাড়ল গগন, 'ও বানিয়ে কথা বলে না। ঝরনাকে মরতে দেখে মা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। চিন্তাশক্তিও। তোরা এমন কেন করলি বিকাশ?'

বিকাশ প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল। যদুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখা পেলে?'

বিকাশ মাথা নাড়ল, 'ওই বাড়িতে নেই।'

'তা হলে কোথায় গেল!' যদুনাথ বিড়বিড় করলেন।

বিকাশ গোরা দত্তকে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

খানিকটা দূরে গিয়ে বিকাশ বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে ঝরনা, মানে ওঁর মেয়ে, কাল রাত্রে গুলিতে মারা গিয়েছে।'

'সে কী? কার গুলিতে?' গোরা দত্ত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'সেটা কি আইডেন্টিফাই করা যাবে? করে লাভ কী! যখন গ্রামে আমরা ঢুকলাম তখন বোধহয় ঝরনারা বাধা দিতে গিয়েছিল—।'

'কিন্তু ওর বাবা তো আমাদের পার্টির লোক।'

'ও হয়তো জমি রক্ষা কমিটি করত।'

'তোমাকে এসব কে বলল? গগন?'

'না। ও তখন এখানে ছিল না। ওর একটা বোবা ভাই আছে। সে সব

আমারবই.কম

দেখেছে। ইশারায় বোঝাল আমাকে। আর ওই মৃত্যু দেখে গগনের মা পাথর হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না।' বিকাশ বলল।

'আজ পারছে না, কাল যদি পারে?' গোরা দত্তের চোখ ছোট হল।

'মানে?'

'মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাস নেই। হয়তো একটা তদন্ত কমিশন বসিয়ে দেবেন। তাঁদের কাছে গিয়ে যদি ওই মহিলা কী ঘটেছিল বলে দেন তা হলে আমরা বিপদে পড়ে যাব বিকাশ।' গোরা দত্ত বলল।

'ঠিক আছে। লক্ষ রাখছি, উনি কথা বলছেন জানলে ব্যবস্থা নেবেন।' বিকাশ নিচু গলায় বলল।

'তোমরা তখন থেকে কী কথা বলছ? আমার মেয়েটা কোথায় গেল?' চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন যদুনাথ।

'এই যে দাদা, চলে এসেছে। বাঃ। খুব ভাল।' মদন এসে দাঁড়াল সামনে।

তাকে দেখে বিরক্ত হলেন যদুনাথ, 'একদম বিরক্ত করবে না। আমি আমার মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ও তাই বলো। খবর পেতে চাও!' মদন হাসল।

'তুমি জানো সে কোথায় আছে?'

'দশ টাকা দাও! ধার।' হাত বাড়াল মদন।

নিজেকে সামলাতে পারলেন না যদুনাথ। দুই হাতে মারতে লাগলেন মদনকে। মারের আঘাতে পড়ে গেল মদন। যদুনাথ চিৎকার করলেন, 'আমার মেয়েকে পাচ্ছি না আর ব্যাটা এসেছে টাকা নিয়ে খবর দিতে?'

বিকাশ দৌড়ে কাছে চলে এল, 'তুমি জানো ওঁর মেয়ে কোথায়?'

'আমি বলব না। আমাকে মারল কেন?' মদন কাঁদো কাঁদো হল।

'মেয়েকে না পেয়ে ওঁর মাথার ঠিক নেই। বলো কোথায় সে?' বিকাশ বলল।

'দশ টাকা দিতে বলো। শোধ করব না।'

বিকাশ তাকাল যদুনাথের দিকে। প্রায় বাধ্য হয়ে দশ টাকার নোট তিনি ফেলে দিলেন মদনের সামনে। সেটা খপ করে কুড়িয়ে নিয়ে মদন বলল, 'আমি মিথ্যে বলি না।'

'যা জানিস তা বল হারামজাদা।'

'কাল রাত্রে যখন তাড়া খেয়ে সবাই পালাচ্ছে আমি কিন্তু পালাইনি। ওই গাছটার ওপর উঠে বসেছিলাম। বোমা ফাটাতে ফাটাতে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তোমাদের লোক এগিয়ে আসছিল। সব বীরপুরুষরা লেজ গুটিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু তখনই মা কালীর মতো কাটারি হাতে রে রে করে তেড়ে এল দুটো মেয়ে। তাদের একজন যে ঝরনা তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। উঃ, কী সাহস মেয়েটার। চিৎকার করে বলছিল, 'আয় এগিয়ে আয়, বুকের পাটা থাকে তো বন্দুক ফেলে এগিয়ে আয়।' কিন্তু বুকের পাটা ওদের নেই। তাই গুলি ছুড়ল। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল মেয়েদুটোকে। আমি আর দেখতে পারিনি। চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম।'

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল যদুনাথের। তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। ঝরনাকে আমার পার্টির লোক চেনে। ওকে কেউ গুলি করতে পারে না। আমি তোর জিভ ছিঁড়ে দেব মদনা।'

'আমি মিথ্যে বলি না দাদা।'

ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন যদুনাথ। দু' হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হল? বোকা মেয়েটা এ কী করল। ও ছাড়া আমার যে কেউ নেই। কিন্তু, কিন্তু ও যদি মরে গিয়ে থাকে তা হলে ওর শরীর কোথায়?'

'আমি চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম। কিছু দেখিনি।'

গোরা দত্ত বিকাশকে নিয়ে মোটরবাইকের কাছে গেল, 'লাশগুলো কোথায়?'

'কাল রাত্রেই মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।' আমি দেখিনি।

'এখন কী হবে?'

'কী আর হবে। এখন মাটি খুঁড়ে লাশ বের করলে মিডিয়া জেনে যাবে, সি আর পি ঝামেলা করবে। থাক। আমি যাচ্ছি। সাংসদের কাছে যেতে হবে।' মোটরবাইক চেপে গোরা দত্ত বেরিয়ে গেল।

বিকাশ দেখল যদুনাথ পাগলের মতো বিড়বিড় করছেন, 'আমাদের লোক আমাকে মারল? হে ভগবান! কত পাপ করেছিলাম। ওঃ।'

আমারবই.কম

কাছে গেল বিকাশ, 'আপনি এভাবে ভেঙে পড়বেন না। মদন ভুলও করতে পারে। ওদের বডি তো পাওয়া যায়নি।'

'কী করে পাবে? কাল সন্ধেবেলায় আমি তো বলেছিলাম গ্রামে যে বাধা দেবে তার ডেডবডি মাটিতে পুঁতে দিতে।' উঠে দাঁড়াল যদুনাথ, 'আমি মাটি খুঁড়ব। কোথায় পুঁতেছ তোমরা ওদের?'

পাগলের মতো জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে করতে একজন মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'রতনের টেলিফোন বুথের সামনে গাছের নীচে মাটি খোঁড়া হচ্ছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা কোদাল জোগাড় করে ছুটলেন যদুনাথ। এই সময় সি আর পি-র একটা জিপ আসছিল এদিকে। কোদাল হাতে ছুটতে দেখে ওরা বন্দুক উঁচিয়ে থামাল যদুনাথকে। তারপর সব শুনে নিজেরাই নেমে গেল মাটি খুঁড়তে। প্রথমে একটা হাত বের হল। তারপর শরীর। সেটাকে ওপরে তুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন যদুনাথ। কিন্তু মুখ দেখে মাথা নাড়লেন, 'না, না, এ না!'

পর পর তিনটে শরীর মাটির নীচ থেকে বের করা হল। এখনও শরীরে পচন ধরেনি, কাপড়ে রক্তের চাপ চাপ দাগ, এখন কালচে। তিনটে মুখের দিকে তাকিয়ে যদুনাথ চিৎকার করলেন, 'না না এ আমার মেয়ে নয়। ওরা সব জমিরক্ষা কমিটির মেয়ে। পুঁতে দাও, পুঁতে দাও।'

তিনটে শরীর মাটির ওপর শুইয়ে রেখে আবার খোঁড়ার কাজ চলল। এর পর যাকে পাওয়া গেল তার শরীর ছেলের। যদুনাথ তাকে দেখে শ্বাস ফেললেন, 'হে হে, এ আমার মেয়ে নয়। এ ব্যাটা যতীনের সঙ্গে ঘুরঘুর করত। জমি রক্ষা করবে! এখন বাপের বাসি বিয়ে দেখছে শালা! আপদ গেছে।' কথাগুলো বলে আচমকা ধেই ধেই করে নাচতে লাগল যদুনাথ। তিন পা যাচ্ছেন আর থমকে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'আপদ গেছে! ঊরু ভেঙে দিয়েছি শালাদের। আপদ গেছে।'

নাচতে নাচতে মদনের সামনে চলে গেলেন যদুনাথ। মার খেয়েও কৌতূহল না মেটায় মদন এসেছিল মড়া তোলা দেখতে। তার সামনে দাঁড়িয়ে যদুনাথ হাত নাড়লেন, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাবা। ভয়ানক যুদ্ধ। আপদ গেছে।'

মদন মুখ খুলল, 'সবই কৃষ্ণের লীলা।'

হঠাৎ মাটি খুঁড়িয়েরা চিৎকার করে উঠল, 'আর একটা লাশ পাওয়া গেছে।'

হুড়মুড়িয়ে আসা লোকগুলোকে সরাল সি আর পি-র জোয়ানরা। মেয়েটিকে ওপরে তোলামাত্র অফিসার হুকুম করলেন, 'ওই বৃদ্ধকে এখানে নিয়ে আসুন।'

যদুনাথ সুড়সুড় করে চলে এলেন, 'যুদ্ধটা কুরুক্ষেত্রের, ইয়ার্কি না?'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখুন, চিনতে পারছেন?'

মাথা নাড়লেন যদুনাথ, 'আপদ গেছে।' তারপর দু' হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে লাগলেন। পেছন থেকে এসে মদন তার হাত ধরল। 'ও যদুদা, নিজের মেয়েকে চিনতে পারছ না? ও যে ঝরনা!'

কশ দিয়ে লালা গড়িয়ে এল যদুনাথের, বললেন, 'আপদ গেছে।'

আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম